চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

শ : বৈশাখ ১৩০৮ – কার্তিক ১৩০৯
গ্রন্থপ্রকাশ : ১৩০৯
১৩১০, ১৩১৩, ১৩১৭, ১৩২৭, ১৩৩৩
মাঘ ১৩৪১, চৈত্র ১৩৫১
সংস্করণ : চৈত্র ১৩৫৪
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৫৮
পৌষ ১৩৬১

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

চোখের বালি

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুইজনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরও ঢের আছে।"

রাজলক্ষ্মী। মহিন, ওই তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম-এ পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম-বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন তখন মহেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, কন্যাটি একবার দেখিয়া আসি।"

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, "দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার করা মিথ্যা।"

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভ-দৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্রের কড়ি সুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; অবশেষে দুই-চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, "না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।"

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহপ্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, "বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—"

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, "মা, ওইটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই

তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি ; কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, 'বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।'

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ; টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মভূমি বারাশতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।"

বছর তিনেক পরে আর-একদিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল।

"বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।"

"কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ।"

"পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।"

মহেন্দ্র কহিল, "বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।"

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোনো ভাই মেজবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?"

কাকী কহিলেন, "এ তোমার বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখনই তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।"

এ কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে-কটি কথা বলিলেন তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, "আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন, মেজবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।"

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজবউ কহিলেন, "তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনও উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর-কাহারও দরকার হইবে না।"

মেজবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর-কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয়ই জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোনো সূত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুষ্ক বিমর্ষমুখে বসিয়া ছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনও স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আয় মহিম, বোস্।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।"

অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কষ্টে সম্বরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আহারান্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, "কাকী, তোমার সেই যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে একবার দেখাইলে না?"

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, "তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি মহিন?"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।"

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।"

মা কহিলেন, "তোর পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।"

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিয়া মাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী গো মেজঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?"

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া গেলেন।

২

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী। এখনও বিহারীকে বলাই হয় নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি হয় মহিন। এখন, না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।"

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, "চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।"

বিহারী কহিল, "সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া 'পছন্দ হইল না' বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে তো উত্তম কথা।"

বিহারী কহিল, "কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে, মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের স্কন্ধে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।"

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, "তবে কী করিতে চাও।"

বিহারী কহিল, "যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।"

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, "সে কি হয়, বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয় তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রহিল।"

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, "আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।"

মা কহিলেন, "কেন, কোথায় যাবি।"

মহেন্দ্র কহিল, "দরকার আছে মা, তুমি দাও-না, আমি পরে বলিব।"

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

…। শ্যামবাজারের অনুকূলবাবু নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারায় তাঁহার বাগান-সমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথায় উ তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি নিজ বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, 'আমার কাছে থাক্'; তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমনকি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহ-ভাবনার সময় আসিল, কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অনুকূল বলেন, 'আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।' এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া-গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাসের দিনান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতালার দক্ষিণ-বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রুপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফ-জল-পূর্ণ রুপার গ্লাস শিশিরবিন্দু-জালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণবাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দান্ত করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিস্‌ফিস্ কথা, দুটা-একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অন্নকূলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।"

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতে একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অন্নকূলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, "লজ্জা কী, মা। বাটা ওই ওঁদের সামনে রাখো।"

বালিকা নত হইয়া কম্পিত হস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে সূর্যাস্ত-আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পান্বিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অন্নকূলবাবু কহিলেন, "একটু দাঁড়া, চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।"

বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর-একবার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, 'এই বারো-তেরো হইবে।' অর্থাৎ চোদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরু ভাবে তাহার নব-যৌবনারম্ভকে সংযত সমবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কী।"

অন্নকূলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "বলো মা, তোমার নাম বলো।"

বালিকা তাহার অভ্যস্ত আদেশপালনের ভাবে নতমুখে বলিল, "আমার নাম আশালতা।"

আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়
কোমল। অনাথা আশা!

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহে
কহিল, "বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।"

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, "মেয়েটিকে দেখি
উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হ
তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।"

বিহারী কহিল, "না, বোধ হয় সহ্য করিতে পারিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা নাহ
আমিই স্কন্ধে তুলিয়া লই। কী বল।"

বিহারী গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহি
"মহিনদা, সত্য বলিতেছ? এখনও ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবা
করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে
সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে
হইয়া যাইত।"

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ
ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহু বিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌঁছিল।

মা তখন লুচি-ভাজা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তখনও তাঁহার
বোনঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল।
কলিকাতার হর্ম্যশিখরপুঞ্জের উপর শুক্লসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন
অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা যখন খাবার খবর দিলেন,
মহেন্দ্র অলস স্বরে কহিল, "বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।"

মা কহিলেন, "এইখানেই আনিয়া দিই-না ?"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ আর খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় খাইতে গিয়াছিলি।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে অনেক কথা, পরে বলিব।"

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

তখন মুহূর্তের মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র কহিল, "মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।"

মা কহিলেন, "ক্ষুধা না থাকে তো দরকার কী।"

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

৩

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, "ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা, আমিই তাঁহার বোনঝিকে বিবাহ করি।"

বিহারী কহিল, "সেজন্য তো হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানা প্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।"

বিহারী কহিল, "সম্ভব বটে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে।"

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, "বেশ কথা, সে তো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই

থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।"

মহেন্দ্র। এক দিন দেখিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।'

মাকে গিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।"

মা মনে মনে কহিলেন, 'বুঝিয়াছি, সেদিন মেজবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনঝিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল।'

তাঁহার বারবার অনুরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।"

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া কহিল, "কন্যা তো পাওয়া গেছে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে কন্যা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, "কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ নয়।"

রাজলক্ষ্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুম্বের সুখ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের সুখ না হইলেও আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে, মা।

ছেলের জেদ দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চিত্ত আরও কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার

এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এত বড়ো শয়তানি?"

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কী বলিয়াছে, আমিও জানি না।"

মহেন্দ্রের মা সে কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না।

তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উল্টাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, সে কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনঝি যখন, তখন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না বাছা, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হই। মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।"

বিহারী কহিল, "কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।"

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকটে গিয়া কহিল, "মা, কাকীর বোনঝির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।"

রাজলক্ষ্মী। বলিস কী, বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে। মহিন্দা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই-সকল বাধাবিঘ্নে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "মেজ-বউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকো— দু দিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুশি করিতে পারে। তোমার বোনঝির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক তার—"

অন্নপূর্ণা। দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে ভাঙিতে কতক্ষণ।"

বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার জন্ত ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।"

বিহারী কহিল, "না মা, সে হয় না। সে সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।"

তখন রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "আমার মাথা খাও মেজবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।"

অন্নপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, "বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সব তো জানিতেছই—"

বিহারী। বুঝিয়াছি, কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে, তাহাই

হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ-আশঙ্কায় মুছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন—যাহা হইল তাহা ভালোই হইল।

এইরূপে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিত সুন্দর দেহে, লজ্জিত মুগ্ধ মুখে, আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মা।"

মা কহিলেন, "এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।"

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক-না বাপু, আর একটা বৎসর বৈ তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, "বউএর বাপ মা যদি কেহ থাকিতেন, তাঁহার কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না—কিন্তু জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।"

রাজলক্ষ্মী। (আত্মগত) ওরে বাস্ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ী কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না।

মহেন্দ্র খুব জোরের সহিত কহিল, "কিছু ভাবিয়ো না, মা। এক্‌জামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

৪

রাজলক্ষ্মী তখন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধূকে গৃহকর্মের কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর, ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল; রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিজের বিছানায় শোওয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশাস লুব্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোখের সম্মুখেই নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্ট রস যে কেবল গৃহকর্মের দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহ্য হয়।

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, "কাকী, মা বউকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা জানিতেন, রাজলক্ষ্মী বাড়াবাড়ি করিতেছেন; কিন্তু বলিলেন, "কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না।"

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত ভাবেই বলিল, "পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো অত খাটিতে দিতে পারিব না।"

মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জ্বালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, "তাঁহাকে লইয়া কী করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহাকে আমি লেখাপড়া শেখাইব।"

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেখাও।"

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র জোড়করে কহিলেন, "মাপ করো মেজগিন্নি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই; উহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া-মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।

অন্নপূর্ণা মেজে মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্জায় ভয়ে দুঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, 'আর নয়, নিজের স্ত্রীর

তার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্যায় হইবে।'

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবুদ্ধি মিলিত হইতেই, হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, একজামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল—কাজের প্রতি দৃক্‌পাত বা লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না।

অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, 'মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।'

দিন যায়—দ্বারের কাছে কোনো অনুতপ্তের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আসিলে ক্ষমা করিবেন—নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না। তখন রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেতালার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, 'মহেন্দ্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি—কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে, তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।'

রাজলক্ষ্মী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সম্মুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদ্রিত এবং

দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধূ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী লজ্জায় ধিক্‌কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

৫

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘ কালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে—আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনও আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিগ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না; নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নূতন-আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিত্তদাহে অন্নপূর্ণাকে দগ্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, "ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—"

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, "দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।"

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, "আমার বউ! তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে!"

তখন অন্নপূর্ণা সশব্দ পদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, "তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি, পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এ ঘরে আনিয়াছিলাম।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ভালো কাজ করিয়াছ। ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ।"

মহেন্দ্র কহিল, "এই দেখো, উহার জন্যে স্লেট, খাতা, বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক-আধ ঘণ্টা পড়াইলেই তো ঢের হয়।"

মহেন্দ্র। অত সহজ নয়, কাকী, পড়াশুনার একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে

ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল; মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, "রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।"

এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে। বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপন-কার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল, লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিত, এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, "চুনি।"

চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, "বইটা আনো দেখি—দেখি কোন্‌খানটা পড়িতেছ।"

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্মীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলা ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, "আজ কতটা পড়িলে দেখি।"

আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুব্ধস্বরে বলে, "উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?"

বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, "তবে এত ক্ষণ কী করিতেছিলে।"

মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, "আমি এক জনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।"

আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত, কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই—সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, "নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?"

আশা কহিল, "তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনি কী অগ্রসর হইতেছে।"

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।"

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভর্ৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়—বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়ীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ীর গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।"

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।"

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল; মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার এক্‌জামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।"

এ বয়সে এত বড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া বলে, "আজ কতটা পড়িলে দেখি।"

আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?"

বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরো-নামটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটা ডাগর করিয়া বলে, "তবে এত ক্ষণ কী করিতেছিলে।"

মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, "আমি এক জনের কথা ভাবিতে-ছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।"

আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত, কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো একদিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই—সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, "নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক?"

আশা কহিল, "তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে?"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনি কী অগ্রসর হইতেছে।"

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।"

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভর্ৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়—বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়ীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ীর গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।"

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।"

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল; মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার একজামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।"

এ বয়সে এত বড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, "ওলো তাই চলো, কাশীর ঘরেই যাওয়া যাক—কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আনিতে হইবে।"

আশা এত বড়ো উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল, "তার চেয়ে তুমি বরং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি এক্‌জামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।"

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক; কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন-পাঠন-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। "মহিনদা মহিনদা" করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিত। আশাকে বলিত "বউঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়। এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমিগুলি খুঁজিয়া পাইবে না।"

মহেন্দ্র বলিত, "চুনি, ও কথা শুনিয়ো না—বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।"

বিহারী বলিত, "সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।"

মহেন্দ্র উত্তর করিত, "পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি,

আর-একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।"

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, "চুপ!"

এই-সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। একসময় তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার একপ্রকার বিমুখভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, "মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়; কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।"

মহেন্দ্রের ফেল-করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাঁহার আহারনিদ্রা দূর হইল।

৬

একদিন নববর্ষায় বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পুবদিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নীচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

মহেন্দ্র দ্রুত পদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে।"

বালিকা দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ পরে মহেন্দ্র

ক্রমশ উত্তর পাইল যে মাসিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিসতুত ভায়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেন্দ্র রাগিয়া মনে করিল, 'গেলেন যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া গেলেন!'

শেষকালে সমস্ত রাগ মাতার উপরে পড়িল। তিনিই তো সকল অশান্তির মূল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী যেখানে গেছেন আমরাও সেখানে যাইব। দেখি, মা কাহাকে লইয়া ঝগড়া করেন।"

বলিয়া অনাবশ্যক শোরগোল করিয়া জিনিসপত্র-বাঁধাবাঁধি মুটে-ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছিস।"

মহেন্দ্র প্রথমে কোনো উত্তর করিল না। দুই-তিনবার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, "কাকীর কাছে যাইব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোর কাকীকে আনিয়া দিতেছি।"

বলিয়া তৎক্ষণাৎ পালকি চড়িয়া অন্নপূর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, "প্রসন্ন হও মেজবউ, মাপ করো।"

অন্নপূর্ণা শশব্যস্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "দিদি, কেন আমাকে অপরাধী করিতেছ। তুমি যেমন আজ্ঞা করিবে তাই করিব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।"

বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুই জা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে, এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি ? আমার কি কোথাও শান্তি নাই।"

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বউমানুষের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়ীকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারমুখী।"

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা-খুড়ী যে এমন বিঘ্ন, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাশতে যাইতে চাই।"

বিহারী কহিল, "অনেক দিনই যখন যান নাই তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে, তা বোধ হয় না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার সেখানে না থাকাই ভালো—বর্ষার সময় জায়গাটা ভালো নয়।"

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, "মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। বোঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও-না।"

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং অবশেষে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘ কাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। আজ সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী-পিসিমা-ঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে! মুহূর্তের জন্য আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলক্ষ্মী বলেন, "বেলা হইল মা, তুমি দুটি খাও গে যাও।"

সে কি শোনে। পাখা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া সে উঠে না।

রাজলক্ষ্মী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অসুখ করিবে, মা।"

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে, "আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না, পিসিমা। আহা, কত দিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ! এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদর করিব!"

বিহারী দুই দিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তাহার কাছে রোগের ঔষধ, কেহ বা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে, কেহ বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিসে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ধরে, কেহ বা তাহার কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া লয়। বুড়াদের তাসপাশার বৈঠক হইতে বাগ্দিদের তাড়িখানার সভা পর্যন্ত সর্বত্র সে তাহার সকৌতুক

কৌতূহল এবং স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লইয়া যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

বিনোদিনী এই অস্থানে-পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ড যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, "এই মেয়েকে কিনা তোরা অগ্রাহ্য করিলি।"

বিহারী হাসিয়া কহিত, "ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশকিল।"

রাজলক্ষ্মী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, 'আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত। কেন হইল না!'

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিত। সে বলিত, "পিসিমা, তুমি দুদিনের জন্যে কেন এলে। যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো এক রকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।"

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, "মা, তুই আমার ঘরের বউ হলি নে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।"

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া, পা ছড়াইয়া, দেয়ালের উপর হেলান দিয়া, অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী আর খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। কুসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল; কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণমুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, কলিকাতার খবর সব ভালো।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তবে তুমি এখানে যে!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লওগে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ—" (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) "সে ছেলেমানুষ, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক, সে তোমার।"

আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া তখনই ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আসিল। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, সে কি হয়। আমাদের তুমি নির্দয় হইয়া ফেলিয়া যাইবে?"

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, "আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিস নে, বেহারি—তোরা সব সুখে থাক্‌, আমার জন্যে কিছুই আটকাইবে না।"

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, "মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।"

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, "অমন কথা বলিস নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।"

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, "বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো—বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।"

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিস।"

রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, "শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।"

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

৮

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া যান, মাসিমা চলিয়া যান। তাহাদের সুখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন

তাহাকেই জড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শূন্য গৃহরাশির মাঝখানে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষড়িয়া পড়ে—সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিমুখ সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জ্বালাইয়া খুব সমারোহের সহিত দুজনের অবকাশের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, "চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলো দেখি। মাসি গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া থাক কেন। আমাদের দু-জনার ভালোবাসাতেই কি সকল ভালোবাসার অবসান নয়।"

আশা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিত, "তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি, শাশুড়ী চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।"

তখন সে প্রাণপণে এই-সকল প্রেমের অপরাধ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন ঘরকর্ম ভালো করিয়া চলে না—চাকর-বাকরেরা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন ঝি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আসিল না,

বামুনঠাকুর মদ পাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।"

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন্ জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেগুলা লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরূপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা দুটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যকের সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অস্ত্র একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাকৃটিনি করিয়া রান্নাঘরের ভস্মশয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই-সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের স্রোতে সমস্ত ঘরকন্না ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে ঢাকা-বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। আশা

এই-সকল অপরাধ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার উপক্রম করিবা মাত্র মহেন্দ্র কোনো একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঁজরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোদুল্যমান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কখনও নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন।

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাখির আজ কী হইল।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লজ্জাবোধ করিতেছে।"

আশা সানুনয় স্বরে কহিল, "না ঠাট্টা নয়, দেখো-না উহার কী হইয়াছে।"

মহেন্দ্র খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার উপরের আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে। অন্নপূর্ণা যাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখিকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না—ফুল পড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, "ভালোই হইয়াছে; আমি ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জ্বালাইয়া মারিত।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শূন্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, "আর কেন। ছি ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।"

এমন সময় দোতলা হইতে "মহিনদা মহিনদা" রব উঠিল। "আরে কে হে, এসো এসো" বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের সুখের বাধাস্বরূপ আসিয়াছে—আজ সেই বাধাই সুখের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "যাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।"

আশা কহিল, "ঠাকুরপোর জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।"

একটা কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ীর সংবাদ জানিবার জন্য মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনও সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, "আ সর্বনাশ। কী কবিত্বের মাঝখানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বোঠান, তুমি বোসো, আমি পালাই।"

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, মার কী খবর।"

বিহারী কহিল, "মা-খুড়ীর কথা আজ কেন, ভাই। সে ঢের সময় আছে। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!"

বলিয়া বিহারী ফিরিতে উদ্যত হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল, "বোঠান, দেখো, আমার অপরাধ নাই—আমাকে জোর করিয়া আনিল—পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।"

কোনো জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই-সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়; বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল, "বাড়ির ঐ তো দেখিতেছি—মাকে এখনও আনাইবার কি সময় হয় নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "নিশ্চয়। আমরা তো তাঁর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।"

বিহারী কহিল, "সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। বোঠান, মহিনদাকে সেই দু-মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।"

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল—তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই সন্ধি হইল না—কেবলই খুঁটিনাটি চলিতেছে।"

বিহারী কহিল, "তোমাকে তোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে দুই-এক কথা বলি।"

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হয়।

১০

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইল এবং সে চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলক্ষ্মীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এ চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে—কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন—সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত—তাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরও যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কী পরিবর্তন। সে যে ছায়ার মতো তাঁহার অনুসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, "রাখো রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। জান না যে কাজ সে কাজে কেন হাত দেওয়া।"

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে ছিলাম—আর মা আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।'

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, বধূ যাইতে ইতস্তত করিত—কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই? বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।"

আবার সেই স্লেট-পেন্‌সিল চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা যুক্তিমূলে তুমুল তর্কবিতর্ক। বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্নারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, সঙ্গ যখন অসাড় চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তখনও ক্ষণকালের জন্য মিলনপাশ হইতে মুক্তি

তাহারও মনে হয়—সম্ভোগসুখে ডুবিয়াছি, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।"

মাসীগৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো পালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোকসাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিত ভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন তাহার খোলা বুক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত রূপ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ নাই। রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহুমান দিতেছেন, সময়ে অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী সকলপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ—প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ, স্বাভাবিক—দাসদাসীদিগকে কাজে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই-সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন স্বয়ম্ হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই আশার আনন্দ আবেগ চারগুণ উচ্ছলিয়া পড়িল। যাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়টি এক দিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এসো ভাই, তোমার সঙ্গে একটা-কিছু পাতাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কী পাতাইবে।"

আশা গঙ্গাজল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, "ও-সব পুরানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই।"

আশা কহিল, "তোমার কোন্‌টা পছন্দ।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "চোখের বালি।"

শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "চোখের বালি।"

বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

১১

আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা এক তলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানায় বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত

এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন্‌গুন্‌-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া ক্ষুদ্রতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত—বলিত, "আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত তো কী করিতে।" সেই-সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিল, "আচ্ছা ভাই চোখের বালি, তোর সঙ্গে যদি বিহারীবাবুর বিবাহ হইত।"

আশা। না ভাই, ও কথা তুমি বলিয়ো না—ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো সে লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে—আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভালো, এ কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে।

"একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।"

হাঁ তো হইতই। না হইল কেন। আমার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন আমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চাহে, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।

অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক-একদিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, "আঃ, আর-একটু বোসোই-না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ামৃগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।"

এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, "তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না—তিনি বাড়ি ফিরিবেন কবে।"

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত, "না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালোবাসে—কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।"

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্য নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্য ঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিত, "এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, "রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।"

খানিক বাদে আশা আবার ছট্‌ফট্‌ করিয়া বসিয়া উঠিল, "না ভাই, এবার তিনি সত্য সত্যই রাগ করিবেন—আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।"

বিনোদিনী বলিল, "আহা, একটু রাগ করিলই বা। তোমাদের সুখে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো।"

কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল মুখে তাহার অবকাশ ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে।—'এমন সুখের ঘরকন্না! এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।' (আশার গলা জড়াইয়া) "ভাই চোখের বালি, বলো-না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না ভাই।"

১২

মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া আশাকে ডাকিয়া কহিল, "এ কি ভালো হইতেছে। পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো উহাতে মত নাই—কী জানি, কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।"

মহেন্দ্র কহিল, "না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উঁহাকে রাখা উচিত হয় না।"

রাজলক্ষ্মী বেশ জানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনও পাই নাই।"

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল —কহিল, "মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ ?"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বোঠানকে জিজ্ঞাসা করো-না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর-সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।"

· আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, "বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।"

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনি ছট্‌ফট্ করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভর্ৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল, "বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও—বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, "থাক্, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে উঁহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন দণ্ড।"

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী সহজে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়—সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—আজকালকার চাল চলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, "আমি ভাই কে। আমার মতো অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কী ঘটে, বলা যায় কি।"

আশা সাধ্যসাধনা কাঁদাকাটি করিয়া মরে—বিনোদিনী অটলপ্রতিজ্ঞ। মনের কথায় আশা আরও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এ দিকে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি ক্রমে জাগ্রত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মধ্যে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্র প্রেমোৎসবের মধ্যে যেন ফাঁক খুঁজিতেছিল—কতকটা বিরাম আবশ্যক, কতকটা আত্মসংবরণ।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলাকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান প্যান্টালুন কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

১৩

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না তখন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হও না কেন। পালাইয়া বেড়াও কী জন্য।"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, "ছি ছি!"

আশা কহিল, "কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী গম্ভীরমুখে কহিল, "সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন—যে পর বলিয়া জানে সে আপন হইলেও পর।"

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অন্যায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল, "আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তোমার সাহস তো কম নয়।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভয় কিসের।"

মহেন্দ্র। তোমার সখীর যেরকম রূপের বর্ণনা শুনি, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গা নয়।

আশা কহিল, "আচ্ছা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও—তার সঙ্গে আলাপ করিবে কি না বলো।"

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতূহল ছিল না, তাহা নহে। এমনকি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই।

স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এইজন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁৎখুঁতে এবং খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমনকি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসমিশ্রিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, "তুমি ভাই পারো, যেখানে যাও তোমার বন্ধুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকে তাকে বন্ধু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।"

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট কারণে এ

কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্ চুনি। তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে।"

আশা কহিল, "আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।"

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, 'আমার মতো অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।' আশা তাহা কিছুতেই মানিত না—ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের দুজনের মাঝখানে বিনোদিনীকে সূচ্যগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।"

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাখিল, "কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।"

পরদিন প্রত্যুষে, বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া

বলিল। বিনোদিনী কহিল, "এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আগ চাঁদকে ডাকিল মেঘের কোলে।"

আশা কহিল, "তোমাদের এ-সব কবিত্বের কথা আমার আসে না ভাই, যেন কোনো-মতে মুক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাইও।"

বিনোদিনী কহিল, "সে রসিক লোকটি কে।"

আশা কহিল, "তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই, ঠাট্টা নয়—তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।"

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "স্ত্রীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।"

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে আসিতে আপত্তি! তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা! আর-কেহ হইলে তো এত দিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্র করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই! বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জানে তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারে।

বিনোদিনীও দু দিন পূর্বে আক্ষেপের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, 'এত কাছে পড়িয়া আছি, তবুও সে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি তখন কোনো ছুতা করিয়াও সে সে ঘরে আসে না। এত ঔদাসীন্য কিসের। আমি কি জড়পদার্থ! আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।'

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, "তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—তা হইলেই সে জব্দ হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী অপরাধে তাহাকে এত বড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন।"

আশা কহিল, "না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্রিয়সখীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।"

আশা সানুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক, তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, "লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।"

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—সেইজন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অন্যমনস্ক হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে, আমি যাই।"

আশা কহিল, "আর-একটু বোসো, এবার দেখো, আমি ভুল করিব না।"

বলিয়া আবার জোরেই হাসিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পদে বিনোদিনীর পশ্চাতে আসিয়া নিকটে মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিলেন। আশা তাড়াতাড়ি চোখে মুখ না তুলিয়া আস্তে আস্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, "তোমার হাসির কথা কী মনে পড়িল।"

আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া আঁচলটি বিনোদিনীর মাথার উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, ঠিক বলিয়াছ। এ আমার হইবে না।"

বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া খিলখিল হাসিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাহনি এবং ইশারাইঙ্গিত তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতান্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই সকৌতুক ক্ষীণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।"

বিনোদিনী চমকিয়া মাথার কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "হয় আপনি বসুন আমি যাই, নয় আপনিও বসুন আমিও বসি।"

বিনোদিনী আশার জোরের সঙ্গে অন্যের মতো টানাহেঁচড়ি করিয়া বৃথা লোকদেখানো সবলে মুখ ঘুরাইয়া দিল না। অবশেষে মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার কথামতো আসিয়াছি বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "এই বলিয়া অভিশাপ দিই, আপনার যেন অনেকক্ষণ নড়িবার শক্তি না থাকে।"

বিনোদিনী কহিল, "সে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা আপনার অনেক ক্ষণ খুব বেশি ক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।"

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাথা খাও, আর-একটু বোসো।"

১৪

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য করিয়া বলো, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "মন্দ নয়।"

আশা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।"

মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, "আচ্ছা, ওর সঙ্গে আর-একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আবার আলাপ! এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে।"

আশা কহিল, "ভদ্রতার খাতিরেও তো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর তবে চোখের বালি কী মনে করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর-কেউ হইলে অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সাধিয়া বেড়াইত; তোমার যেন একটা মস্ত বিপদ উপস্থিত হইল।"

অন্য লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, "আচ্ছা, বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার সখীরও পালাইবার তাড়া

দেখি না—অতএব তোমা হতে দেখা হইবেই, এবং দেখা হইলে তাহারা মুগ্ধ করিবে, তোমার বালীর সেটুকু শিক্ষা আছে।"

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না, দৈবাৎ তাহাদের পথেও দেখা হয় না।

পাছে বিদ্রূপের আকারে প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক সাধারণ ঔৎসুক্য গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ঔৎসুক্য আরও যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঔদাস্য তাহাকে আরও উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিন মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে হাস্যচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার আদরের বালীটির চোখের বালির কেমন লাগিল?"

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশার কাছ হইতে এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্য সবুর করিয়া যখন ফল পাইল না তখন কৌশলক্রমে কথাটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোখের বালি কোনো কথাই বলে নাই। সেজন্য আশা সখীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

আশা কহিল, "রোসো, দু-চারি দিন আগে আলাপ হউক, তার পরে তো বলিবে। কাল অল্প ক্ষণের দেখা, কটা কথাই বা হইয়াছিল।"

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্য প্রকাশ করা তাহার পক্ষে আরও দুরূহ হইল।

এই সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী মহিনদা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া?"

মহেন্দ্র কহিল, "দেখো তো ভাই, কুমুদিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বোঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী-একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকে তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।"

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; কহিল, "বোঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরও যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তখন বড়ো সন্দেহের কথা।"

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া, আরক কিনিয়া, ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, "না।"

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য সখীকে উপযুক্তরূপ জব্দ করিবে।

আশ্চর্য এই, শিলাজিনী কোনোদিন নিজের চেহারা দুনাই না। কিন্তু আশার পরে আসিয়া দেখিল তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িল। তারপর একখানি কাল শাল দিয়া, মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, হাতে মাথা রাখিয়া, এমনি সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেশ বলিল, "ঠিক হয়ে হইয়াছে, যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেশ পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য শিলাজিনীকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নানা দিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। তারপর, আলোর দিকে যদি শয়নের বিছানার কাছে আরো খোলা ফুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল, সহজ না হওয়ায় সুরমার দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশালতা কানে কানে বলিল, "আমার কাছে আলোটা একটুখানি বাঁ-দিকে সরাইয়া দাও।"

সরমা আশা কানে কানে বলিল, "আমি ঠিক পারিব না, তুমি সরাইয়া দিও—তুমি সরাইয়া দাও।"

মহেশ সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে শিলাজিনী জাগিয়া, চোখ মেলিয়া দেখিয়া, হঠাৎ, উঠিয়া বসিল। আশা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শিলাজিনী হাসাই দাম করিল, তাহার কোমল দুই চোখে নরম বিরক্তির ভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি জানি।"

মহেশ বলিল, "আসুন, ইহাতে আর দোষ নাই। কিন্তু তুমি জাগিলে, এখন তোমাকে মনে হয় আসিল না, ইহাতে যে আমার উৎসাহ একেবারে দূর হইল। অনুগ্রহ করে শুইয়া দিয়া আমার মনের কথা দিবেন।"

আবার শিলাজিনীকে শয়ান করিয়া দিল। ছবি লওয়া হইল।

কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। সুতরাং পরের দিন আর-একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই সখীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী 'না' বলিতে পারিল না। কহিল, "কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহু দূর অগ্রসর হইয়া গেল।

১৫

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয় পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্যালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্প কালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল—প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিখাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল—সুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আসে, সেটা দূর করিতে মানুষ আবার যে নেশা চায়, সে নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এমন কেহ তাহার নিষেধ চেষ্টা করিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাস-পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত। তাস-খেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্যায় ফাঁকি দিত তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরুণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে সে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে। এইরূপে তিন জনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকন্না দেখা, রাজলক্ষ্মীর সেবা করা, সমস্ত সে নিঃশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অধীর হইয়া বলিত, "চাকর-দাসীগুলোকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি।"

বিনোদিনী বলিত, "নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।"

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে—

বিনোদিনী। না, সে হইবে না—তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে—কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।

বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্রয় দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিন দুপুরে অতিরিক্ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াহ্নের

অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়—গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক্‌, ধোপার বাড়ি গেছে কি আল্‌মারির কোনো একটা অনির্দেশ্য স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই-সকল বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্য ভর্ৎসনা করিত—মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণ্য-হীনতায় সস্নেহে হাসিত। অবশেষে সখীবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না—বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চট্‌পট্‌ সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল—আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তখনই রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল। আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল সখীহস্তের প্রসাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন

বিনোদিনী তাহাকে দেখিতে পাইল।

বিহারী কিছু তীব্র স্বরে কহিল, "ঠিক কথা। বহুর চিকিৎসা বড়ো কঠিন। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমিই তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। এতক্ষণ আর বাতাস বন্ধ করিবেন না।"

আশার দিকে চাহিয়া কহিল, "বোঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।"

১৮

বিহারী ভাবিল, 'আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।'

বিহারী আহ্বান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে—তুমিও সেই দলে না মিশিয়া একটা নূতন পথ দেখাও—দোহাই তোমার।"

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, যাহাকে কেহ কোনো কাজে লাগায় না—

মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উপযুক্ত বস্তু নয় যে, বিহারী, তাহাকে চেষ্টা করিতেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "মাটি হইতে অবশ্য বাধা নাই, বিহারীবাবু।"

বিহারী কহিল, "বিশেষ কিছু না করিলেও তাহার ভয় হইতে পারে। একবার সাহস দিয়া দেখোই না।"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অনাবধান থাকিতে হয়। কী বল ভাই, চোখের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও-না, ভাই।

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, "তোমার এই ভিক্ষুক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিছু দে, ভাই।"

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।"

বিহারী যে সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্র থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্রও বিরক্ত হইল। খোলসা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। সে ঈষৎ তীব্র স্বরেই কহিল, "বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে যান না—হাতে যা আছে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।"

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে!

বলিয়া সে সকটাক্ষ হাস্যে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার

তখন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেখানে দাবি করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন, মহেন্দ্রবাবু।"

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জো নাই। মিষ্টান্ন দিলেও মুখ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল—মহেন্দ্র অন্য দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না, সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, "বিহারী, বিনোদিনী হাজার হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়—তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।"

বিহারী কহিল, "তাই না কি। তবে তো কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মাপ করিতে হইবে।"

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই,

বলিয়া ব্যাকুল চক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি—তাহারই শাস্তি?"

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলই মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করুণ চক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন-না।"

বিহারী মুশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, "অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, নাহয় আর দু-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কী।"

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, "আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন, কিন্তু আপনারা বড়ো অন্যায় করিতেছেন।"

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষুপল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা দ্রুত বেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "কয় দিন মাত্র আসিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না—কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠান, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় করিবে।"

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

কাঠকয়লার সরবরাহ বাহির হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ঝুড়ি-চুপড়ি এবং ছোটো ছোটো লোহার টিনের কৌটা বাহির হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাবু, আপনি যে আমাকে ছাড়াইয়াছেন। এসব তো বুঝিতে পারি নাই, এসব শিখিলেন কোথা হইতে?"

বিহারী কহিল, "ডাক্তারি করিতে শিখিয়াছি, নিজের সব নিজেকেই করিতে হয়।"

বিহারী বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বসিল, কিন্তু বিনোদিনী লজ্জিত হইয়া বিহারীর মুখে করুণ চোখের কৃপা দান করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া রাঁধাবাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। অল্প ক্ষীণ প্রকৃতির হাতে রন্ধন করিতে লাগিল, বিহারী তাহাকে যোগ দিল। কিন্তু সহজে ব্যবহার করিবার কোনো চেষ্টা করিল না। সে খুঁটির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর-একটা পা তুলিয়া বসিয়া বহিরের উপরে মৌমাছিদের খেলা দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, "বিহারীবাবু, আপনি ঐ কাঠের আগুন জ্বালিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এখানে স্নান করিতে যান।"

কুয়ার জল এক ঘড়া বিনোদিনী তুলিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি সময় মতো ছাড়িয়া দিয়াছিল। স্নান তো দুপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বাগানের বারান্দায় পাশ ফেলিয়া শয়ন হইল; মনে কোনোরকমই সাধ মিটিল না, এবং বেলিতে বেলিতে ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অপর ব্যক্তির মধ্যে দিয়া ঘাস বন্ধ করিয়া দিয়া দিনের উপাসনা করিল।

বিনোদিনী মাথার উপর একটুখানি কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, "আমি তবে এখন যাই?"

বিহারী কহিল, "তোমার কষ্ট হইবে, একটু বস বলব। আমাদের

দেশের কথা বলুন।"

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনীর মুখে খর-যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ-পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর-একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনও সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস-কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনও নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রী-ভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, 'বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।' বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, 'প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।' বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না, প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ-সকল কথা এ-পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষত,

৬

কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আন্তরিক স্বাভাবিক ভাবে কথা কয় নাই—আজ সহসা অনর্গল নিজের সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নবধারাসিক্তের মত স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপক্রমে প্রায় মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘুম ছুটিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, "এবার ফিরিবার উদ্যোগ করা যাক।"

বিনোদিনী কহিল, "আর-একটু সবুর করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "না, [illegible] হাতে পড়িতে হইবে।"

জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, হঠাৎ কোনো সাহেবলোকের প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।"

আর-একটা গাড়ি ঠিক করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলই মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আজ দিনটা বিনা মাটি হইয়াছে।' অধীর সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমনি হইল।

শুক্লপক্ষের চাঁদ তখন শাখাপ্রশাখার অন্তরাল হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বাগানে ছায়ালোক খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী-একটা অপূর্বভাবে অনুভব করিল। আজ সে যখন পক্ষীশিশুর জন্য আপনাকে ছড়াইয়া দিল, তাহার মধ্যে গর্বের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল বহিয়া পড়িতেছে। কাছে আসিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কী ভাই চোখের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন।"

বিনোদিনী কহিল, "কিছু না ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমার বড়ো ভালো লাগিল।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বিস্মিত আশা এ-সব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল, "ছি ভাই চোখের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।"

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র সুদীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।

১৮

চড়িভাতির দুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর-একবার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-জ্বরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অসুখ ও দুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, "দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমিই যে অসুখে পড়িবে। মার সেবার জন্যে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।"

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই-তিনবার

ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে—একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার দু ঘণ্টা যায়।"

অনুতপ্ত আশা লজ্জায় ম্লান হইয়া বলে, "আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।"

"বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।"

ইহা আশার পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভর্ৎসনা সে কখনও পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, 'তুমিই তো আমার কর্ম-শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।' এ ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্ম-শিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা -সাপেক্ষ। সে মনে করিত, 'আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতা -বশতই কোনো কাজ ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারি না।' মহেন্দ্র যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছে তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক-একবার তাহার রুগ্‌ণা শাশুড়ীর ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, এক-একবার লজ্জিত ভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে; সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কী একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে; কিন্তু তাহার সেই অপরিস্ফুট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অনুভব করে, তাহার চারি দিকের সমস্তই সে যেন নষ্ট করিতেছে—কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন

সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবিদাখিল করিল। কহিল, "তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও দিবে?"

আশা কহিল, "আমি কি লিখিতে জানি।"

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছের অলকগুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, "তুমি অক্ষয়কুমার দত্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার—চারুপাঠ যাহাকে বলে।"

আশা কহিল, "যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিয়ো না।"

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্ট্‌ম্যান্টো সাজাইতে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমত ভাঁজ করা কঠিন, বাক্সে ধরানো শক্ত—উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বাক্সে ধরিত তাহাতে দুই বাক্স বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল তাহাতে আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বারবার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি কৌতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্য দোষারোপে পূর্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে তাহা আশা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। সহিস দশবার গাড়ি-তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না—অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঘোড়া খুলিয়া দাও।"

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠি লেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্তহৃদয়ে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলক্ষ্মী আজ দুই দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে

ছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে; তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, 'সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।'

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার-তেলে-দাগ-পড়া মহেন্দ্রের বসিবার কেদারা, কাগজ-পত্র-ছড়ানো ডেস্‌ক্‌, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র বারবার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া ঝাড়পোঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে

মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদিবে। যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পাষণ্ড জগতে কে আছে। তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, 'বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায়, সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।'

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, মহেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা দ্রুত পদে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "এ কী বিহারীবাবু! আপনার কি অসুখ করিয়াছে।"

বিহারী। কিছু না।

বিনোদিনী। চোখ দুটা অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মহেন্দ্র কোথায় গেল।"

বিনোদিনী মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "শুনিলাম, হাসপাতালে তাঁহার কাজ পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারীবাবু একটু সরুন, আমি তবে আসি।"

অন্যমনস্ক বিহারী দ্বারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে সুদৃশ্য নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনী চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল, "বিনোদ-বোঠান, আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত

ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কূজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেক ক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহু যত্নে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল— তাহা সাধ্বীনারীহৃদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই দুই-এক দিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি অসুবিধা তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সে-সমস্ত অপসারিত হইয়া, কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানসী মূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া, চিঠিখানা বাহির করিয়া, নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল [illegible]দিন মহেন্দ্র যে এসেন্স্ আশাকে উপহার দিয়াছিল সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। যেমন বাঁকাচোরা

বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। দুখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব। তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই দু-ছত্র চিঠি লিখিলাম—হে আমার পাষাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া, রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল; কে যেন বলিল, 'পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা!' চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র।—যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর-অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া।

তোমার মন হয়তো ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনও নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি; যখন চুপ করিয়া ছিলে, তখনও মনের কথা বলিয়া

দেখিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার ভুল হইতে সেই অবধি সব কথা মনে করিয়া দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম সে কি ভুলিই [illegible] নাই।

সে যাই হোক, ভুল হোক, সত্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর ফিরিবে না, যাহা লিখি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আপশোষ। ছি ছি, এমন লজ্জা [illegible] নাই। কিন্তু আমি বলিয়া মনে করিও না, তাহা যে লজ্জা সে কিসের [illegible] তাহার প্রমাণ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না পাও [illegible], যদি উত্তর না লিখিতে পার এই প্রার্থনা।

[illegible] আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, [illegible] করিয়াই [illegible] [illegible]। [illegible] মনে মনে, তাহাকে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible] লিখিয়া [illegible] করিল।

এমন সময় [illegible] ঘরে প্রবেশ করিল। [illegible] [illegible] [illegible] মুখের দিকে চাহিয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] [illegible] উঠিয়া, [illegible] চিঠি [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

কিন্তু [illegible] মুখ [illegible] [illegible]। [illegible] করিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] করিল, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, "এখনই সেখান হইতে আসিতেছি।"

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, 'হতভাগ্য বিহারী। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।' বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় একবার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়্‌খড়্‌ করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সবাইকে কেমন দেখিলে।"

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, "বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে?"

মহেন্দ্র কহিল, "আজকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে, বাড়িতে অসুবিধা হয়।"

বিহারী কহিল, "এর আগেও তো নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে নাকি।"

বিহারী কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, এখনই বাড়ি চলো।"

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল; কিন্তু বিহারীর অনুরোধ শুনিয়া সে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, "সে কী হয়, বিহারী। তা হলে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে।"

বিহারী কহিল, "দেখো মহিনদা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্যায় করিতেছ।"

মহেন্দ্র। কার 'পরে অন্যায় করিতেছি, জজসাহেব।

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায়, মহিনদা!"

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাসপাতালে।

বিহারী। থামো মহিনদা, থামো। তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মনে একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারও দুঃখকষ্ট আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আশা কাঁদিতেছে কী জন্য।"

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, "সে কথা তুমি জান না, আমি জানি?"

মহেন্দ্র। তোমার মহিনদা সর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিনদার সৃষ্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত, বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই—এ উপসর্গ কবে জুটিল। সেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে নাকি। বেচারা বিহারী! মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু দুঃখবোধ না করিয়া মনে একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একান্ত ভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। 'অন্য লোকের কাছে যাহারা আদরের ধন, কিন্তু আমারই অধীন, আমার কাছে যাহারা চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে'—ইহাতে মহেন্দ্র মনের মধ্যে একটা গর্বের তৃপ্তি অনুভব করিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল, "আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।"

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় শরৎকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া মহেন্দ্রের সামনে সে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। মহেন্দ্র তাহার উপরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কী করিয়া।"

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার-পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলা ছিঁড়িয়া ফেলো।"

বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, "আমি কর্তব্যের অনুরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?"

আশা ছলছল চোখে কহিল, "এবারকার মতো আমাকে মাপ করো। এমন আর কখনোই হইবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "কখনও না?"

আশা কহিল, "কখনও না।"

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, "চিঠিগুলা দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি।"

মহেন্দ্র কহিল, "না, ও থাক্।"

আশা সবিনয়ে মনে করিল, 'আমার শাস্তিস্বরূপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।'

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না—বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল।

বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, 'এ তো বড়ো অদ্ভুত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখা যাইবে—উল্টা হইল। তবে সে চিঠি গুলার অর্থ কী।'

নারীহৃদয়ের রহস্য বুঝিবার কোনো চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে দৃঢ় করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, 'বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব।' আজ সে মনে মনে কহিল, 'না, এ তো ঠিক হইতেছে না। যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদ-প্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।'

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, "দেখিতেছি, আমিই তোমার সখীর চোখের বালি হইলাম। আজকাল তাঁহাকে আর দেখিতেই পাওয়া যায় না।"

আশা উদাসীন ভাবে উত্তর করিল, "কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।"

এ দিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, "বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।"

মহেন্দ্র চকিত ভাব সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন, মা।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কী জানি বাছা, সে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কাহাকেও খাতির করিতে জানিস না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর-যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।"

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "বালি!"

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল, "কী, মহেন্দ্রবাবু।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী সর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।"

বিনোদিনী আবার চাদর-সেলাইয়ের দিকে নত চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "তবে কী বলিয়া ডাকিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার সখীকে যা বল—চোখের বালি।"

বিনোদিনী অন্য দিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না— সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!"

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়তি সুতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, "কী জানি, সে আপনি জানেন।"

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, "কালেজ হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।"

আবার বিনোদিনী দন্ত দিয়া সুতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল, "এখন বুঝি জিয়ন্তের আবশ্যক?"

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্যপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গাম্ভীর্যের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ব্যবধানটাকে কোনো একটা নাড়া দিয়া ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যাঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া, হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশাল

উজ্জ্বল চক্ষু মহেন্দ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল, "কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি যে সকল ছাড়িয়া আমাদের বাসায় যান, সে কি তাহারও অপরাধ। আমারও যাইতে হইবে না? আমাদের কর্তব্য নাই?"

মহেন্দ্র তাহার উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।"

বিনোদিনী অত্যন্ত মনোযোগে ছুঁচে সুতা পরাইতে পরাইতে কহিল, "কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।"

মহেন্দ্র গম্ভীর চিন্তিত মুখে জানালার বাহিরে একটা সুদূর নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শুনা যায়, এমনি হইল। অনেক ক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিস্তব্ধতাভঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে কোনো অনুনয়-বিনয়েই রাখা যাইবে না?"

বিনোদিনী আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল, "কিসের জন্য এত অনুনয়-বিনয়। আমি থাকিলেই বা কী, আর না থাকিলেই বা কী। আপনার তাহাতে কী আসে যায়।"

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নিচু করিয়া সেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল—মনে হইল, হয়তো বা তাহার চোখের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দেখা দিয়াছে। বাহিরে অপরাহ্ন তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজল স্বরে কহিল, "যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে ?"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল। তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক্ হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল।

বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব-কথোপকথনের অনুবৃত্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, "আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্তব্য তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।"

আশা স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, "তবে এই কথা রহিল! তাহা হইলে তিন-সত্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।"

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, "ভাই চোখের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল ?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল ; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া। আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসন্নমুখে স্বাভাবিক ভাবে কথা কহিবে। এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার

আশার পরিস্ফুট ছিল। সে গম্ভীরমুখে কহিল, "আমারই তো হার হইয়াছে।"

বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "আমাকে মাপ করো।"

বিনোদিনী কহিল, "অপরাধ কী করিয়াছ, ঠাকুরপো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাসিয়া ভালো মুখেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই চোখের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাসা কি একই হইল।"

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, "কখনোই না।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কী বলো ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ্ কয় জন পাওয়া যায়। যেমন আমার সাথী, তেমনি সখী অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইব কেন।"

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থ ভাবে বিপন্ন থাকিতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কহিল, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।"

মহেন্দ্র আবার দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কহিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়াছিল। মহেন্দ্র বারান্দায় তাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, "ভাই বিহারী, আমার মতো মূঢ় আর জগতে নাই।"

এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।"

বিহারী কহিল, "একটু বাদে আসছি, বিনোদ-বোঠান।"

বিনোদিনী কহিল, "একবার শুনেই যাও-না।"

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল—ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে পাইল, সেখানে বিষাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল; কহিল, "আচ্ছা, বিহারী-ঠাকুরপো, আমার চোখের বালির সঙ্গে কি তোমার সতিন-সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, "বিধাতা আমাকে তেমন সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।"

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি? বিহারী-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন—তোর রুচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষ্মণটির মতো এমন সুলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিখিলি না—তোরই কপাল মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বোঠান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিসের।

বিনোদিনী। সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নহিলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে বলিতে পার?"

শুনিয়াই বিহারী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তাহা তো জানি না। কিন্তু হইয়াছে নাকি।"

বিনোদিনী। কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না।

বিহারী উৎকণ্ঠিতমুখে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। কথাটা খোলসা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে ব্যগ্র ভাবে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর সেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, "মহিন্দার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণভাবে কহিল, "কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার চোখের বালির জন্য আমার সেইজন্যই ভাবনা হয়।" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বোঠান, একটু বোসো।"

বলিয়া একটা চৌকিতে বসিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উসকাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দূর প্রান্তে গিয়া বসিল। কহিল, "ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না—কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো—সে যেন অসুখী না হয়।"

বলিয়া যেন হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, "বোঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই, এই সরল মেয়েটিকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও—তুমি তাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি তো আর

উপায় দেখি না।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী— অসহায়া বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণহৃদয় সাধারণ ইতর লোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ—যেন—কিন্তু সে-সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবী-হৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি—তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিস সে কখনও কাহারও কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র, উন্নত—আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্য দয়ায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া, নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষণ্ড বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল,

মহেন্দ্র সেখান হইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনোই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের এবং সুপরিচিত স্থানের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত শ্রান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শয়নঘরে আনিয়া, বুকের কাছে টানিয়া, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া বলিল, "ভাই চোখের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো অলক্ষণা।"

আশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, "কেন ভাই, অমন কথা কেন বলিতেছ।"

বিনোদিনী রোদনাকুলিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া বলিল, "আমি যেখানে থাকিব, সেখানে কেবল অমঙ্গল ঘটিবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।"

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি ভাই, অমন কথা বলিস নে—তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না—আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আসিল।"

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী সেদিন একটা ছুতায় পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার অসাবধানী ঘরকন্নার আর একটু স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ি গাড়িতে যাইবার [illegible] জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ লইয়া সে উপস্থিত হইল। "বিহারী-ঠাকুর" বলিয়া [illegible] হঠাৎ বেহারীকে [illegible] দেখিয়া [illegible] দুই হাতে [illegible] উঠিল। আশার [illegible] হইল, কিন্তু বিনোদিনী তাহার চোখের [illegible] করিয়া কিছু বলিল না, [illegible]

এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অন্যায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিত-হৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশী চলিয়া যাইব।"

আশার বক্ষস্থল ধক্‌ করিয়া উঠিল; কহিল, "কেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল, এ কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল। নিজের সুখদুঃখের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসিমাকে সে যে ভুলিয়া ছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাসী-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনহৃদয়া বলিয়া বড়োই ধিক্‌কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; স্নেহপূর্ণ নীরব আশীর্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মস্তকের উপর দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাৎ স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ স্নেহাতিশয্যে যে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা সূচনা। ভালো কি মন্দ কে জানে।

ভয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার

সেই পরমেশ্বর আপনার আদেশ অনুসরণ করিতে পারিল। কহিল, "তুমি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাসিমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমস্ত অর্পণ করিয়া গেছেন, তোমার অমঙ্গল কোনো অবস্থায় হইতে পারে না।"

রাধা তখন দুচিত্তে সমস্ত ভয় দূর করিয়া ফেলিল। রাণীর এই আশীর্বাদ সমস্ত অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিল। সে মনে মনে আপনার মাতার মাসিমার পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একান্তমনে কহিল, "মা, তোমার আশীর্বাদ আমার সার্থক হউক, সফল হউক।"

অন্তরিক্ষে চন্দ্র উঠিয়া গেল, ঝিকিমিকিটি কিছুই বলিতে পেল না। ঝিকিমিকি মনে মনে কহিল, 'কিন্তু আমার কথা হইল আমার আমার উপর থাক। এমন শত্রু তো দেখি নাই। কিন্তু, এসব মানুষ চেনাই চলিবে না।'

২৩

ঝংকারবাসিনী অদৃশ্য হইবার পর হঠাৎ মাতৃস্নেহ অর্পিতে দেখিয়া তখন তেমন আনন্দ আতুর হইয়া গেলেন, যেমনি তাঁহার হইয়া না হইল, তুমি আপনার হইয়া বাহু প্রসারিয়া আবার তোমায় নিবেদন করিয়াছে। এক মুহূর্ত তাঁহার সমস্ত বাহির ভরাইয়া দেখিবার অধিকার করিতে পারিয়াছে। মানুষ কিছুমাত্র হইতেই সমস্তপ্রাণ প্রাণ ও মনের সমস্ত আবেগ অন্তরে তুলিয়া আনে। তাহারা উপর হাত দিয়া সম্মুখে তাহার হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, হাসিয়া তাহার দিকে আর রূপ করিতে উৎসব দিয়াছেন। কিন্তু দিয়াছেন সব হইতে মাতৃস্নেহ কাঁপিয়া উঠিয়াছে যে সম্পূর্ণ আমার অন্তরে, তাহার অধিকারবলে তুলিবার, তোমারই সমস্ত দিয়া দিতে আসে। সে সময়

যে ভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংসারিক বিপ্লব আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে, ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রুগ্ন শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অন্য ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠানে এ কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই-সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোনো নালিশের কথা তুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অন্য পথে গেল। যে মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে ঢিলা হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল্‌ দেখি, চুনি কেমন আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে তো বেশ ভালো আছে, কাকীমা।"

"আজকাল সে কী করে মহিন। তোরা কি এখনও তেমনি ছেলেমানুষ আছিস না কাজকর্মে ঘরকন্নায় মন দিয়াছিস।"

মহেন্দ্র কহিল, "ছেলেমানুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝঞ্ঝাটের মূল সেই চারুপাঠখানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে—লেখাপড়া শেখায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্তমনে পালন করিতেছে।"

"মহিন, বিহারী কী করিতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "নিজের ভার তাহা আশঙ্কাই করিতেছি। মাসো-মেসোমশায় যাহার বিবাহপত্রি দেন, কী হবে জেনে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল এই দশা। তাহার নিজের ভার পরে লয়, পরের ভার সে নিজে লয়।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।"

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কই, কিছুমাত্র উদ্‌যোগ তো দেখি না।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ে গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোনঝিকে দেখিয়া একবার বিহারী আমাদের সহিত বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অকস্মাৎ খণ্ডিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, 'কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়ো না।' সেই ব্যথা অভিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাঁহার একান্ত অনুগত সেই ছেলেটিকে তিনি এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এখন কী জানি যদি বিহারীর মন পড়িয়া থাকে।'

মহেন্দ্র অনেক রাত্রি ধরিয়া, অনেক গল্পচ্ছলে, তাহাদের ঘরকন্নার আনুষঙ্গিক সমস্ত খবর-বার্তা জানাইল, কেবল বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কাশীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যলাভের মধ্যে যেমন সুখ, আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকট থাকিয়া প্রতিদিন সেই সুখ অনুভব করিতেছিল— তাই সে এক এক দিন করিয়া কাটাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল উপশম

হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয় দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার স্নেহমুখচ্ছবির সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতঙ্ক হাস্যকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন-কি তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, 'আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।'

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, "কাকীমা, আমার কালেজ কামাই যাইতেছে—এবারকার মতো তবে আসি। যদিও তুমি সংসারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আসিয়া আছ, তবু অনুমতি করো, মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইব।"

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসির স্নেহোপহার সিঁদুরের কৌটা ও একটি সাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসিমার সেই পরমস্নেহময় ধৈর্য এবং মাসিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ির নানাপ্রকার উপদ্রব স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, "আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসিমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধুলা লইয়া আসি। সে কি কোনো-মতেই ঘটিতে পারে না।"

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছু দিনের জন্য কাশীতে সে তাহার মাসিমার কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, "তোমাদের তো সব নিজের মতোই আসা যাওয়া হইবে, সেই সঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।"

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল, "মা, বউ তোমার সঙ্গে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।"

রাজলক্ষ্মী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, "বউ যাইবে তবে তো সবাই যাইবেন। যাও, উঁহাকে লইয়া যাও।"

মহেন্দ্র যে আবার অন্নপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভালো লাগে নাই। বধূর যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, "আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। উহার জেঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়োলোক, কখনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, উঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত গৌরব।"

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রর মন একেবারে কঠিন হইয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও বিহারী, শুনিয়াছিস? আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া যাইবে?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না না, মহিন কেন যাইবে। সে হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবে, বউ তাহার জেঠা-মশায়ের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব বিবি হইয়া উঠিল।"

বিহারী মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হইল—বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গেল, আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে; দু-জনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া কত দিন চলিবে? বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিব না—দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?'

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই—তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আশা-বোঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "না হইবে কেন। বাধাটা কী আছে।"

বিহারী কহিল, "বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে?"

মহেন্দ্র কহিল, "মাসিমাকে দেখিবার ইচ্ছা, প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।"

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সঙ্গে যাইতেছ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।— পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, "না।"

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না।

মনে মনে ভাবিল, 'কেবল আশা যদি কোনো রকম পথ করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী কেন তাহার সহায় হইবে?' তাই ধীরে ধীরে কহিল, "বিনোদ-বোঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলো। আমার সঙ্গে চালাকি করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সত্য বন্ধুর মতো তোমার মনে থাকিত, তবে এত দিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে রাখিয়া চলিতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।"

অত্যন্ত বেদনার স্থানে হঠাৎ পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তেমনি বিহারী সেইরূপ অসহ্য আঘাতে চৌকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল—হঠাৎ থামিয়া বড় কষ্টে শ্বাস রোধ করিয়া বলিল, "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি বিদায় হই।"

বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।"

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কী, বিনোদ-বোঠান।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমিও কাশী যাইব।"

বিহারী কহিল, "না না, বোঠান, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না। তোমাকে মিনতি করিতেছি—আমার কথায় কিছুই করিয়ো না। আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভালো হইবে না। তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিয়ো। আমি চলিলাম।"

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনম্র নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল, "আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না।"

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল 'আমি পাষণ্ড'—তাহার পর আবেগ-শান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে সে ভালোবাসে—ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড়ো একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত, তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতূহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই-

সময় বিনোদিনী ইতস্তত করিয়াছিল—আজ একটু অনায়াসেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী আশাদের ঘর হইতে যেমন বাহির হইয়া আসিল, যেমন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, এবং বিনোদিনী আকস্মিক আঘাতে বাধা দিয়া চলিয়া গেল, তাহা মহেন্দ্রের মনে অভিভূত করিয়া দিল। এই দুটি ব্যাপারে তাহার অন্তর অভিভূত করিয়া দিল। সে বুঝিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না। কিন্তু আজ যাহা ঘটিল, যাহা দেখিল, তাহা তাহাকে স্থির হইতে দিল না, তাহাকে চারি দিক হইতে বিভিন্ন আঘাতে পীড়ন করিতে লাগিল। আর কেবলই নিজের অভিযোগের কথা মনে হইতে লাগিল, 'বিনোদিনী ভাবিতেছে আমি বলিয়াছি, আমি তাহাকে ভালোবাসি না।'

২৫

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, 'আমি বলিয়াছি - বিনোদ বোঠান, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি না। কথাটা অতি কঠিন করিয়া বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি তাহা নাই হইল, কিন্তু ভালোবাসি না এ কথাটা বলা অন্যায়। এ কথায় আঘাত না পায়, এমন স্ত্রীলোক কে আছে। ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর কোথায় পাইব। ভালোবাসি এ কথা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু ভালোবাসি না এই কথাটাকে একটু ফিরাইয়া নরম করিয়া আসা দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন একটা নিষ্ঠুর আঘাত খুব বাজিয়া থাকিয়া যাওয়া অন্যায়।'

এই বলিয়া মহেন্দ্র আশার অগোচরে ঘরে উঠিয়া আর-একবার আদরের চিঠি লিখিতে বসিল। মনে মনে কহিল, 'বিনোদিনী আমাকে যে ভুল বুঝিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে বিনোদিনীর কাছে আমার ভ্রম স্বীকার করিয়া আসিয়াছি তাহা নহে। সে যেমন আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। আমি তবে

তাহাকে ভালোবাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোনো সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কী করিবে। এমনি করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়তো সে বিহারীকে ভালোবাসিতেও পারে।'

মহেন্দ্রের ক্ষোভ এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাঞ্চল্যে সে নিজে আশ্চর্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। নাহয় বিনোদিনী শুনিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে ভালোবাসে না—তাহাতে দোষ কী। নাহয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে—তাহাতেই বা ক্ষতি কী।

ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুনি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস ঠিক করিয়া বলো।"

আশা ভাবিল, 'এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।'

সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো—আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।"

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য বাহির করিবার জন্য কহিল, "তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন।"

আশা কহিল, "আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।"

মহেন্দ্র। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, "তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।"

হয়েছে। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাসির কাছে বেশ দু-দিন ভালো থাকিবে।

আশা কহিল, "কখনো না। আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহি নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি বেশ দেখিতেছি চুনি, তুমি মনে-মনে [illegible] বিরহ করিতে রোজ রোজ রোগা হইয়া যাইতেছ।"

শুনিয়া আশা চক্ষের জল সংবরণ না করিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া [illegible] মুখ ঢাকিল, আমার কাছে আসিয়া হইয়া রহিল—কিছুক্ষণেই আমার কাছে আর চাপা রহিল না; তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য হেসে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা কিছুতেই হাসিল না। অবশেষে এই অভিমানে মহেন্দ্র মুখে পরে বিদ্রূপের মুখ হইতে লাগিল।

যেখানে কথা বিহারীর বিনোদিনী অন্তরের ছিল, সেইখানে হঠাৎ কেন্দ্র কথায় পড়িয়াছে হইয়া মহেন্দ্রও মনে একটা বেদনার ধারা দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, অথচ সেই অভিমানের বিহারী বিনোদী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি সে কিছু প্রতিবাদ করিত, তাহা হইলেও কেন বিনোদিনী একটু তৃপ্তি হইত। কেন হইতেছে, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে যে আঘাত করিয়াছে, তাহা আমার মতোই ছিল। বিনোদিনী আমার মতন মনে কেন এমন আমাকে অপমানিত? এই অপমানে বিনোদিনীর যে দুঃখ হইয়া থাকে, সে তার অনুশোচনা— বিনোদিনী কেন বিধিমত হইল।

কিন্তু বিনোদিনী সেই দুর্ভাগ্যক্রমে একটির পারে সব বিনোদিনীর মনের মধ্যে মনে তাহার অনুতাপ করিতে দিল। বিনোদিনীর আমার যে মনোবেদনা, অভিমানে ছিল, যে সেই কথা মুখ খুলিয়া বলিতে লাগিল। কেবল সেইদিন থেকে মনে মনে বিনোদিনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া থাকে সেই প্রতিশোধের বিনোদিনী তাহার সকলে আর একটা অপেক্ষা করিয়া [illegible]

লাগিল; তাহাকে সুস্থ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্যের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ঔৎসুক্য জন্মিল।

দুই-তিনদিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সান্ত্বনার পত্র লিখিল, কহিল—

> ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুষ্ক মুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও—সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।
>
> তোমার বিনোদ-বোঠান

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাকে বিহারী ভালোবাসে, এ কথা যে এমন রূঢ় করিয়া এমন গর্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনও মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্রাহত হইল—তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, 'অন্যায়! অসংগত! অমূলক!'

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষ্যে সেই-যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধ-প্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার

মনে করিয়া নিশ্চিন্ত অন্তরালের মহিম একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগিল, এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হইয়া উঠিল। [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিল, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া উঠিল; [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল না, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া
দিল।

তখন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিল, '[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]?"

[illegible] করিল, "[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible], [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলক্ষ্মীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে বোঠান বলিয়া দুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।

সাধুচরণ কহিল, "ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।"

শুনিয়া বিহারী দ্রুত বেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, "যাই, একটা কাজ আছে।"

বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার চিঠি।"

দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে—অপরাধিনী বিনোদিনীর লজ্জিত মুখ একবার সে দেখিয়া আসিবে, কোনো কথা বলিবে না। এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বে আর-একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুঝাইল—বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দর জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

মদন সেটা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা [illegible] [illegible] [illegible],
সেইজন্য সর্বদা উদ্বেগ তাহার মনের উপর [illegible] [illegible] আসিয়াছে।
চিঠিখানা পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মদন [illegible]
হইতে পারিল না, চিত্রলিপির [illegible] [illegible] কোন্ দিক। [illegible] সে সেই
আশঙ্কা হইতে লাগিল, 'যদি সে তাহাকে [illegible] না করিয়া [illegible]
[illegible], সেই অভিমানেই চিত্রলিপি [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] চেষ্টা
করিয়াছে। [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible]?'

এই কথা মনে করিয়া মদনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া
উঠিল। যে চিত্রলিপি তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল,
সে যে [illegible] [illegible] স্পর্শ তাহার [illegible] হইয়া যাইবে,
সেই [illegible] [illegible] স্থির থাকিতে দিল না। মদন ভাবিল,
'চিত্রলিপি আমাকে যদি [illegible] [illegible] [illegible], তবে চিত্রলিপির সঙ্গে
[illegible]। এক [illegible] সে [illegible] হইয়া পড়িবে। আমি নিশ্চয় [illegible] [illegible],
আমি [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] করিব না। সে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। আমি [illegible] [illegible], আমার
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। কিন্তু সে যদি [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]
[illegible], তবে তাহার কী [illegible] হইতে পারে কে জানে?'

মদন স্থির করিল, [illegible] [illegible] না দিয়া চিত্রলিপির সঙ্গে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

মদন [illegible] [illegible] [illegible] দেখিল, চিত্রলিপি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। বলিল, "[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] না। এই [illegible] চিঠি দিয়া [illegible]।"

মদন চিঠিখানা দেখাইয়া দিল।

চিত্রলিপি বলিল, "[illegible] [illegible]?"

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরত পাঠাইয়াছে, মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাঙ্গের শিরা দব্‌ দব্‌ করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল, সে অন্য কাজে অনুপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না—সেই দুই-চারি লাইন কালীর দাগকে অতীত হইতে, বর্তমান হইতে, একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই 'না' করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো-কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

২৫

সেদিন নূতন ফাল্গুনে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিতেই আশা অনেক দিন পরে সন্ধ্যার আরম্ভে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। একখানি মাসিক কাগজ লইয়া পণ্ডশ প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিবার সময় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্বেগে

হাসিতেছিল, এ দিকে সুহাসিনী [illegible] দিল [illegible] [illegible] [illegible] দেখিয়া থাকিয়া আসিয়া উঠিয়াছে। আশা [illegible] [illegible] [illegible] পারে না, আশা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিল। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাসিয়া বলিল, "[illegible] তোমার [illegible], মাথা খাও, এ [illegible] পড়িয়া দেখো। এমন [illegible] পড়িয়া আর কাঁদিয়া [illegible] না।"

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরম্ভ করিল।

[illegible] [illegible] [illegible] আশা [illegible] [illegible] করিয়া স্থির করিয়া [illegible] [illegible] বন্ধ করিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। [illegible] মুখ দেখিবামাত্র আশা [illegible] উঠিল। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] চেষ্টা করিয়া বলিল, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

আশা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিল, "[illegible] কি শরীর [illegible] ভালো নাই?"

[illegible]। শরীর বেশ আছে।

আশা। [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিল, "[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

আশা কোনো উত্তর না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রহিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল, [illegible] [illegible] [illegible] না।

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না ?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসিকে দেখিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল, "কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।"

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই ; পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক, এখন না'ই গেলাম।

মহেন্দ্র। থাক্ কেন। যাইতে চাহিয়াছিলে, যাও-না।

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।

মহেন্দ্র। এই সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল ?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া, চোখ নিচু করিয়া, বসিয়া রহিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের সঞ্চার হইল। কহিল, "আমার উপর মনে মনে তোমার কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে নাকি। তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও ?"

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা নম্রতা ধৈর্য মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, 'মাসির কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বলো যে, আমি যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও। তা নয়, কখনও হাঁ, কখনও না, কখনও চুপচাপ— এ কী রকম।'

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনও হঠাৎ এত আদর করে, কখনও হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে,

তাহা যে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

[illegible] তখনই আমার মনে হইল, [illegible]

[illegible]

[illegible]

পাশে শোওয়াইল। আশার রোদনবেগ থামিলে সে কহিল, "মাসিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না। কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্র কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।"

আশা কহিল, "না, আমি কাশী যাইব।"

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না— এ কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছু দিনের জন্যও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন-সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। যে-সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে-সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আবার! ও কথা বলিয়ো না। কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে।"

আশা কহিল, "তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি

কিনা হাসিতে [illegible] হইয়াছি।"

মহেশ। কিন্তু [illegible]। তোমার এমন [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible] দিব।

মালা। তোমাকে কোন [illegible] না, কেবল তুমি [illegible] না।

মহেশ। [illegible] [illegible] কোন [illegible] করিবে?

মালা। [illegible]।

মহেশ। আচ্ছা, তাহা হইলে [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]।

এই বলিয়া মহেশ [illegible] [illegible] [illegible]' বলিয়া [illegible] ফিরিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ পরে [illegible] [illegible] [illegible] ফিরিয়া বলিল, "তুমি [illegible], তুমি [illegible] [illegible] [illegible]।"

মালা [illegible] হইয়া বলিল, "[illegible] [illegible] করিয়াছ [illegible]। [illegible] [illegible] না [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

মহেশ বলিল, "আচ্ছা।"

বলিয়া [illegible] ফিরিয়া চলিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিল, "[illegible] [illegible], [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া বলিল, "[illegible] [illegible], [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] না।"

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] তুমি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]। [illegible] [illegible] না, [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible]

শুনিস নাই। এ-সকল কথা যখন উঠিল তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত—তুমিই বলো-না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কত দূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল, "কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে-সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের ভাই। ও কথা ভুলিতে হইবে।"

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "আচ্ছা।"

২৬

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর-এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনও বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, 'বউ গিয়াছে, তাই এ বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।' আজকাল মহেন্দ্রের সুখদুঃখের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল; তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্ষ ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন।

বিরাজবিবিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাই, [illegible] পর বহিয়া আমার [illegible] [illegible] হইয়াছে। আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারি না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না করিলে [illegible] [illegible] পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]।"

বিরাজবিবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কী বউ, কী ভাবিতেছ? [illegible] ভাবিবার মত কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের ঘর কর।"

বিরাজবিবি বলিল, "আর নাই, মা।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি, আমি [illegible] যা পারি তাই করিব।"

বলিয়া তখনই তিনি [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। বিরাজবিবি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার অসুখ শরীর, তুমি যাইও না, আমি যাইতেছি। আমাকে বলিয়া দিলে, তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।"

রাজলক্ষ্মী [illegible] [illegible] [illegible] শুরু করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই [illegible] না। [illegible] [illegible] বিরাজবিবি [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible]। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে, মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো, নীচের বিছানায় শুভ্র জাজিম্ তক্‌তক্ করিতেছে, এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুল-কাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত—তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহু দিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'এগুলি তুই কার জন্যে তৈরি করিতেছিস, ভাই।' বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, 'আমার চিতাশয্যার জন্য। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।'

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণ ভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবসুদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে ; খাটের সম্মুখে দুটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শখের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব-ইতিহাসের যে-কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেজের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নূতন বালিশ-গুলির উপর মাথা রাখিবা মাত্র একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল—বালিশের

[illegible] কিছু [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মহেন্দ্র কহিল, "খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরও পাওনা বাকি থাকিবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তোমার হিসাব যে-রকম কড়াক্কড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।"

মহেন্দ্র কহিল, "হিসাবে যাই থাক্, আদায় কি করিতে পারিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।"

বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা।"

এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, "কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।"

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ, তখন যাইবে কোথায়।"

বিনোদিনী কহিল, "ছি ছি, ছাড়ো। যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন।"

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিছানায় সুগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, নির্জন ঘর, নববসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যেন ধরা দিল-দিল—উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না এমনি বোধ হইল।

[illegible] কহিল, [illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু কিছুই [illegible] না।

[illegible] কহিল, "[illegible]"

[illegible] কিন্তু [illegible] না—[illegible] কহিল, "না না, আমার [illegible] নাই, আমি [illegible] না।"

[illegible] কহিল, "[illegible] কি [illegible] কিছু [illegible]?"

[illegible] কহিল, "আমার কিছুই চাই না। [illegible]"

[illegible] কহিল, "[illegible]"

[illegible] কহিল, "না, [illegible] না, [illegible]"

[illegible]

[illegible]

আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি—তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়—সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ দুটি চোখের প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত। তুমি শীঘ্র এসো, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্যায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মুহূর্তকাল-বিস্মরণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।'

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে সুদূরে অনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকণ্ঠে সেহাগ-রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল, সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া এবং মনের উদ্‌বেগ দীর্ঘ পত্রে নানা রূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবা মাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল, গতরাত্রে আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্বার পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, 'করিয়াছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার। ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিঠি লিখিল—

তুমি আর [illegible] [illegible] [illegible]। তোমার [illegible] যদি
শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিও, আমি নিজে
গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে একা আমার ভাল
লাগিতেছে না।

১৬

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তিনি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible], তুই [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] মাসি, আমি [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] তুমি
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] [illegible], তুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] [illegible] [illegible]?"

"[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।"

"কিরকম।"

"আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান তিনি কিরকম তুনো— লোকে মনে করে তিনি অহংকারী। কিন্তু তা নয় মাসি, তিনি দুটি-একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।"

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল-দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে-মনে হাসিলেন; কহিলেন, "তাই বটে, সেদিন মহিন যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই।"

আশা দুঃখিত হইয়া কহিল, "ওই তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাসেন না, সে যেন একেবারে নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।"

অন্নপূর্ণা শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "আবার যাকে ভালোবাসেন, মহিন যেন জন্মজন্মান্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।"

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোখ নিচু করিয়া হাসিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুনি, বিহারীর কী খবর বল্‌ দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।"

মুহূর্তের মধ্যেই আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরুত্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বল্‌ চুনি— বিহারীর অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি তো?"

বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া

[illegible] [illegible] নাই, এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

কমল বলিল, "আমি, শিবানী-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
করিতে না?"

[illegible] [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "[illegible] [illegible]?"

কমল বলিল, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

বলিয়া সে [illegible] উঠিয়া গেল।

[illegible] চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]?

শিবানীর এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]

মহেন্দ্র অর্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই—আজ আর স্নান করিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "স্নান না কর তো দুটিখানি খাইয়া লও।"

বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অনুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিতচক্ষে বলিল, "ভাই বালি, এখনও তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও।"

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেল গাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারো কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কত দিনের জন্যই বা যায় আসে।'

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্র-ভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, "নাঃ, আমার কালেজ আছে, আমি যাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার আবার গোপনীয় কী থাকিতে পারে, শুনি।"

মহেন্দ্র ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই মনে করো, যদি বিহারীর কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিত।"

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল; সে যেন দ্বিতীয় বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মুহূর্তে-প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মাপ করো, আমার পরিহাস মাপ করো।"

বিনোদিনী সবেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, "পরিহাস করিতেছ কাহাকে। যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম। তোমার ছোটো মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।"

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবা মাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেষ্টন করিয়া বাধা দিল।

এমন সময়ে সম্মুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দগ্ধ করিয়া শান্ত ধীর স্বরে কহিল, "অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না সেখানে বউঠাকরুন আছেন। না জানিয়া তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কখনও কোনো পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেজন্য তাঁহাকে যেন কখনও কোনো দুঃখ সহ্য করিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।"

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তাহা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।"

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, "আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক্।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি।"

বিনোদিনী কহিল, "মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায় তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায় তাহারা আমার কেহই নহে?"

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?"

বিনোদিনী কহিল, "মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"

মহেন্দ্র তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, "তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আমি আজ ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ—যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আর নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি, মাপ করো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।"

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাদে-বিছানো রৌদ্রে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি দ্রুত পদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আলমারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "একটু রোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি।"

বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল, "দোহাই তোমার, আর যা কর সাহায্য করিয়ো না।"

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, "বটে! আমাকে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক।"

বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ওগো মশায়, তুমি রাখো, আমার কাজ বাড়াইয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।"

বলিয়া আলমারির সম্মুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যুষ হইতে যেরূপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংগীতে গাহিবার, উপন্যাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্পনিক আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত, কিরূপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্যতাকে কী উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র

ঠাওরাইতে পারিতেছিল না—এই অসংকোচ আশা ও উঁহার সহিত হাসি-তামাশা করিয়া সে যেন অবচেতন একটা অসংগত দুঃখ আপনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, বউ কাপড় তুলিয়াছে, তুই এখানে বসিয়া কী করিতেছিস?"

বিনোদিনী কহিল, "দেখো তো পিসিমা, মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিলক্ষণ! আমি আরও উঁহার কাজে সাহায্য করিতে-ছিলাম।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার কপাল! তুই আবার সাহায্য করিবি! জান, বউ, মহিনের বরাবর এইরকম। চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া, ও যদি কোনো কাজ নিজের হাতে করিতে পারে।"

এই বলিয়া মাতা পরম স্নেহে গর্বে পুত্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্মণ্য একান্ত মাতৃমুখাপেক্ষী স্বভাবটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবা ব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মহিমা যে মহিন বুঝিয়াছে এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, "বউ, আজ তো তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নূতন রুমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন-আদর করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটাইয়া মারিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল তবে বুঝিব তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।"

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন, "আহা মা, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।"

বিনোদিনীর কাপড় তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব না এখন তোমার অন্য কাজ আছে ?"

বিনোদিনী কহিল, "না পিসিমা, অন্য কাজ আর কই। চলো, মিঠাই-গুলি তৈরি করিয়া আসি গে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে ?"

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।"

বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই ঠাকুরপোর বই-পড়া শুনিতে আসিব—কী বল।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, 'মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।' কহিলেন, "তা বেশ তো, মহিনের খাবার তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস মহিন।"

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা।" কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, 'আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব—দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিব।' বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে

পায়চারি করিয়া বেড়াইল, চিঠির দিকে অনেক বার চাহিল, শেষে ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, "আমি আর চিঠিটি স্পর্শ না করিয়া বাক্সে জ্বালাইয়া দিব, এর শীলমোহর খুলিয়া চিঠির রস আর দিলে তাহাতে বিদ্ধ পারে না।"

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীরমুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল, "ও কী ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে।"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু অসুখ করে নাই তো?"

বিনোদিনী কহিল, "এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে। ভালো হয় নি বুঝি? তবে থাক্। না না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না না, কাজ নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভালো মুশকিলেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিয়াছেও ভালো, তুমি বাধা দিলে চলিবে কেন।"

দুটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল— তাহার একটি দানা, একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না।

আহারান্তে তিন জনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুই যে কী সব পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর্ না।"

মহেন্দ্র কহিল, "কিন্তু তাহাতে ঠাকুর-দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভালো লাগিবে না।"

ভালো লাগিবে না! যেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্য রাজ-লক্ষ্মী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষায় পড়ে, তবুও তাঁহার ভালো লাগিতেই

হইবে! আহা, বেচারা মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে— তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহা ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, "এক কাজ করো-না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শান্তিশতক আছে, অন্য বই রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।"

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণ ভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, "মা, কায়েত-ঠাকরুন আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।"

কায়েত-ঠাকরুন রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু ঝিকে বলিলেন, "কায়েত-ঠাকরুনকে বল্‌, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য করিয়া আসেন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো-না।"

বিনোদিনী কহিল, "কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত-ঠাকরুনের কাছে গিয়া বসি গে।"

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোসো—দেখি, যদি কায়েত-ঠাকরুনকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও, আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো না।"

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবা মাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর।"

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, "সে কী, ভাই। আমি তোমাকে

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি অভ্যাসের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেন না—সে তাঁহাদের বিনা বেতনের, বিনা যত্নের, বিনা চিন্তার অনুগত লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, 'তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।' মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা আহ্বানে, বিনা আড়ম্বরে, তাঁহাদের নিকটে নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে, রাজলক্ষ্মী তাহা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কাহারও কাছে কৃতজ্ঞ হইবার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে। যখন অন্নপূর্ণা ছিলেন তিনি রাখিতেন বটে; রাজলক্ষ্মী ভাবিতেন, 'বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।'

রাজলক্ষ্মী আজ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।"

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে—এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড়ো ভালোবাসেন।"

রাজলক্ষ্মী সস্নেহ গর্বে কহিলেন, "আর-কাহারও মাছের ঝোল তাহার মুখে রোচে না।"

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আসে নাই। কহিলেন, "আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।"

বিনোদিনী কহিল, "আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে—বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।"

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে—কেন সে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্য কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে-সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দু'দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, "কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।"

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া নাহয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণ-চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিতে থাকে, যদিও এ-পর্যন্ত তাহার কল্পনার

অসম্ভব কিছুই হয় নাই—শুধু হেমন্তের রৌদ্রের আলো আকাশকে মধুময় করিতে লাগিল। আমার কল্পনার সমস্ত কোলাহল তাহার অমল অপরূপ শান্তির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখানা কী। মার আজ কোনো রূপ সাড়া নাই। কত দিনের মধ্যে বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি বেশ বিশ্রাম করিতেছিলেন। আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই ব্যাপারে মনটা দমিয়া গেল—ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোনো সুযোগে বিনোদিনীর সঙ্গে এক মুহূর্ত নিভৃতে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই মন বসিল না, খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনের পঙ্‌ক্তিতে মিনিট দুই আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিতটে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া যোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধুমধাম যে?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ওটা তোমাকে বলা নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্র অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।"

রাজলক্ষ্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমাকে যে বাহির যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাস, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মুহূর্তের জন্য মহেন্দ্রর মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হলে উনি যান না, পিসিমা। এবার আজ

বিহারীঠাকুরপো একলাই খাইবেন।"

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। 'অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই—বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল' ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রান্না ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না —ঠাকুরপো মুখে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উঁহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।"

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।"

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয় ঈর্ষায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কী ক'রে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কী করিয়া। দেখিয়া জ্বলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত আত্মীয়-ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মতো অবারিত ভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মুহূর্তের জন্য সে থমকিয়া দাঁড়াইল—একটা অশ্রুতরঙ্গ পঞ্জরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার জন্য তাহার বক্ষকপাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে

বিহারী আজ ঘরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। বিহারী যখন তখন যাতায়াত করিত এবং এরূপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুদূরপ্রবাস হইতে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলক্ষ্মী সস্নেহে তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ বিশুদ্ধ সহানুভূতি-বশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোথায়।"

রাজলক্ষ্মী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, "মহিনের আর কোথায় নিয়ম আছে, সে আর কিছুতেই থাকিতে পারিল না।"

শুনিয়া মাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আইনের তর্কের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মন হইতে সকল চিন্তা-বাষ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইয়াছে শুনি।"

বলিয়া আহার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রান্নাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর স্নেহের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে খুব বলিয়া জাহির করিল, আহারব্যাপারে চিরদিন বিহারী মাতৃস্নেহশালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ আকর্ষণ করিত। আজ সেই প্রচুর পরিমাণ আহারে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতূহল দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে তাঁহার স্নেহপূর্ণ অতিথির আহার দিলেন।

এমন সময় হঠাৎ আসিয়া বিহারীকে খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কী বিহারী, কেমন আছ।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না ?"

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।"

স্নান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কী ঠাকুর-পো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।"

বিহারী কহিল, "সকলকেই কি চেনা যায়।"

বিনোদিনী কহিল, "একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।"

বলিয়া খবর দিল, "পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র বিহারী খাইতে বসিল, রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেশন করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেশনে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেশন করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল—মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরও বেশি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপসি মাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, "না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাসে।"

মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি চাই না।"

শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অনুরোধমাত্র না করিয়া সে মাছ

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমি ঠিক কথা সাজাইতে পারি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।'

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, 'চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমত করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।'

কুলিখিত তুচ্ছ পত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত ততই তাহার অক্ষর খারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র 'শ্রীচরণেষু' লিখিয়া নাম সহি করিলেই অন্তর্যামী মহেন্দ্র সকল কথা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠি লেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতখানি ভালোবাসা দিয়াছেন, একটুখানি ভাষা কেন দেন নাই।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর বলিল, "মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।"

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাছা, আমিও তো মূর্খ, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।"

আশা কহিল, "তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মূর্খের সেবায় খুশি না হন।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি যত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।"

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাসির এই কথা হইতে সান্ত্বনা গ্রহণের অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ কথা কিছুতেই তাহার মনে হইল না। সে নতমুখে বসিয়া তাহার মাসির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তখন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন, তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন, রুদ্ধ কণ্ঠকে দৃঢ় চেষ্টায় বাধামুক্ত করিয়া কহিলেন, "চুনি, দুঃখে কষ্টে যে শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে—সেই দিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।"

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মাসিমার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, সেই মাসির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাসি সকল সংসারের উপরে যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানার উপরে বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, 'আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজন্য অপরাধ লইয়ো না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, তাহাতে, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো। তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসিমার মতো পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।'

এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার কলিকাতায় ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বক্ষণে অন্নপূর্ণা আশাকে কোলে বসাইয়া কহিলেন, "চুনি, মা আমার, সংসারের শোক দুঃখ অমঙ্গল হইতে তোকে রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই উপদেশ—যেখান হইতে যত কষ্টই পাস, বিশ্বাস, ভক্তি স্থির রাখিস, তোর ধর্ম যেন অটল থাকে।"

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "আশীর্বাদ করো মাসিমা, তাই হইবে।"

৩১

আশা ফিরিয়া আসিল। বিনোদিনী তাহার গলা ধরিয়া অভিমান করিল—"ভাই, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখানা চিঠি লিখিতে নাই?"

আশা কহিল, "তুমিই কেন লিখিলে নাই, বালি?"

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব। তোমারই তো লিখিবার কথা।

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। কহিল, "জান তো ভাই, আমি ভালো লিখিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।"

দেখিতে দেখিতে দুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, "দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।"

আশা। সেইজন্যই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই—গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জব্দ। লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস ভাই। ঠাকুরপো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা।

আশা হাসিয়া কহিল, "তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম।"

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে সেইটিকে রক্ষা কর্‌, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস নে ভাই, বালি। বড়ো ল্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হস্ত দ্বারা তর্জন করিয়া বলিল, "যাঃ, কী বকিস

আর ঠিক নেই।"

কাশী হইতে ফিরিয়া আশার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, "তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।"

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না—কিন্তু মূঢ় আশার কিছুই ঠিকমত চলে না, তাহার মন যখন এত খারাপ ছিল তখনও তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া উঠিয়াছিল। একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উল্টা বলিতে থাকে।

আশা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন ছিলে।"

আগে হইলে মহেন্দ্র অনেক ঠাট্টা, অনেক মনের কথা বলিত, 'মরিয়া ছিলাম।' এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, "বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।"

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছে—তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধায় তাহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করিয়া ভাবিল, 'আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।' স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসীমা ভালো আছেন তো?"

সে প্রশ্নের উত্তরে কুশল সংবাদ পাইয়া তাহার আর দ্বিতীয় কথা মনে আসিল না। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ

নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এত দিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া কথা কহিলেন না, এমন-কি আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন। আমি মাসির অনুরোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।' অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্টহৃদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্‌বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তোর অসুখ করিয়াছে, মহিন।"

মহেন্দ্র বিরক্ত ভাবে কহিল, "না মা, অসুখ কেন করবে।"

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিস না!

মহেন্দ্র পুনর্বার উত্ত্যক্ত স্বরে কহিল, "এই তো, খাচ্ছি না তো কী।"

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একখানা পাতলা চাদর গায়ে, ছাদের এ ধারে ও ধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ কামাই থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটিদুই-তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র—বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক, সে কটা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্য বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল।

লজ্জিত লালায়িত আশা ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নূতন লজ্জা আসে—

বোতলটিতে ঢালিয়া খাওয়া যায় কিন্তু বোতলটির ভিতরের দুধ [illegible]
পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নূতন মতামতের প্রয়োগ হয়। তাহা
তাহার এই চিরপরিচিত আবদ্ধপ্রাচীর আর অসাধ্য কেমন করিয়া
প্রবেশ করিল। বাহির আর আবদ্ধ থাকিয়া হইল—সম্মুখে
কোথাও যাওয়া যাইবে না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া
অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অন্ধকারে হঠাৎ কোথাও পড়িয়া [illegible]
তবে সে পড়িয়া মরিয়া যাবে। অপরিচিতের মধ্যে [illegible] আসিয়া
অনুভব করিল, সম্মুখে সুপারিটি। তখন তাহার ভিতর [illegible]
তাহাকে [illegible] চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ
বিপরীতদিকে এক [illegible] হইয়া [illegible] কোথায় গিয়া গেল।

[illegible] নিজেকে [illegible] হইয়া [illegible] উপর গিয়া উঠিল।
তবু তাহার [illegible] হইল যে, সম্মুখে যদি [illegible]
সুপারি [illegible] হইতে ভাসিয়া উঠিত। কিন্তু আর তাহার [illegible] না,
কেননা, সম্মুখে সুপারিটিকে না। [illegible]
[illegible] ছিল, [illegible] হইয়া [illegible]
যে নিজেকে [illegible] করিয়াছিল, তাহা [illegible]
[illegible] পারিয়াছিল। [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible] দিয়াছিল। কিন্তু কী [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible] করিতে, সম্মুখে তাহা [illegible] পারিত
না, [illegible] করিতে লাগিল, [illegible]
পারিল, কিন্তু [illegible] পারিল না। [illegible]
[illegible] হইলে [illegible] কী [illegible]

[illegible] নিজেই [illegible] যে [illegible] দূর করিতে দিল। [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible]
[illegible] পারিল না।

আশা ভাবিতে লাগিল, 'এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।' যে জায়গায় যথার্থ বিপদ সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল পর হইতেই সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল-সকাল কলেজে গেল। কলেজ-যাত্রা-কালে আশা বরাবর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতে একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্যপ্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অনুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে—তখনও তাহার স্নান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংযত কেশ, শুষ্ক মুখ—দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি।

গাড়ি চলিয়া গেল, আশা সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। পৃথিবী, সংসার, সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তখন জোয়ার আসিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে, আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটিতেছে—সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকল্লোলের অদূরে এই একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

হঠাৎ এক সময় আশার মনে হইল, 'বুঝিয়াছি। ঠাকুরপো আসি

গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে যেন আশার হৃৎপিণ্ডের রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার মধ্যে আমারও কোনো যোগ আছে। দুই জনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি! এমন সন্দেহ! কী লজ্জা! একে তো বিহারীর সঙ্গে আমার নাম জড়িত হইয়া নিন্দুকদের কাছে ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে তবে তো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না—বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেন্দ্র কোনো কোনো কথা না বলিয়া যে-সেই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বারবার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রর মনে এমন কোনো সন্দেহ জাগিয়াছে যাহা নিজেই সে প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো তাহার চেহারা হইবে কেন। দুধ গিয়াছে তো এমন ভুলিয়া হাত হইতে পড়িবার কথা নহে।

মহেন্দ্র বাড়ি হইতে চলিয়া যাওয়াতেই যে আশার বুকে বজ্র ঠেকিয়া গেল, তাহা সকল দিক যে হইতে দুঃখিত করিতে লাগিল এবং অপ্রকাশের অন্ধকারের মধ্যে, সেইরূপ অন্তর্যামীর মতো, সেই সন্দেহ, আশার সেই অকারণ ভয় ক্রমে, এই ঘটিল মাত্র, সেই অনিশ্চয়-সংকুল দুর্দিনে, ক্রমশ সেগুলি আকারে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণার কাছে যাইবার যে প্রস্তাবটি আশার মনের মধ্যে উঠিতেছিল, বিনোদিনীর প্ররোচনায় তাহা দৃঢ় হইয়া আসিল, আশার মন ক্রমেই বিমুখ হইতে

কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্‌টা উচিত? বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনও তাহার যে ভালোবাসা আছে তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্য-নীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুই-চন্দ্র-সেবিত গ্রহের মতো এই ভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল-সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে যত্নে স্নিগ্ধ-আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না; কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিস্তব্ধ ঘরে সেই শূন্য শয্যার মধ্যে কোন্ স্মৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবপরিণয়ের নিত্যনূতন লীলাখেলা? না। সূর্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে-সকল স্মৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র-উজ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিগ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিদ্রূপ লইয়া সেই

কাছাকাছি হয়ে পড়িতে লাগিল, সন্ধ্যার পর তিলোত্তমী জলাভূমির পড়িয়া চরাইতে চরাইতে তাকে বাধ্য হইয়া থাকিত, বাড়ির দেওয়ালে ঘুমাইয়া পড়িত, যাকে বিদ্যুৎ শব্দে সেই শব্দ বিধিমত তিলোত্তমীর সবসময় যেন আবেশে ডুবিয়া ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, হঠাৎ সে আচ্ছন্নভাব কাটিয়া যাই চোখ মেলিয়া চাহিয়া পড়িত, মাঝে মাঝে বলিত 'আমাকে নিচের দিকে পথে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি'। সেই-সময় মধ্য শঙ্করের মনে পড়িয়া তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল। বাড়ি ফিরিতে চলিল— শঙ্করের মতো মনে হইত আলগা হইয়া গেলি, একটুই আলো জ্বালিয়া পড়িত, কিন্তু আলো আসিত না। শঙ্কর ভাবিল, 'আমি যে কাহারো ঘর ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আলো যদি আমার হাতে করিয়া না আসে তো আমি কী করিব।' এই বলিয়া নিঃশব্দে তিলোত্তমীর মাথাকে বক্ষে জড়াইয়া করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না, দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। চাঁদ উঠিয়া গেছে, চারিদিক জ্যোৎস্নাধারা যেন প্লাবিত হইতেছে। অদূরবর্তী জলার নিস্তব্ধ এবং দূরে যেন শব্দ মানুষের পদধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট শুনিয়া গেল হইতেছে, আকাশ নক্ষত্রের উপর দিয়া মানুষের নিঃশব্দ নিঃশ্বাস করিয়া সমস্ত দুঃ শব্দ প্রবাহিত করিয়া দিতেছে।

[illegible]

খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও।"

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি।"

বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়া ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে !"

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৩১

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর স্নিগ্ধশ্যামল মেঘে দগ্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্বেই কলেজে গেছে। তাহার ছাড়া কাপড়গুলো মেজের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া ধোবাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক ; এইজন্য আশার প্রতি তাহার অনুরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত ; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে—মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর।

চকিতের মধ্যে আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পড়িল—

কাল রাতে তুমি যে কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না। আজ আবার কেন খেদির হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, সে কী মনে করিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

জগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোনো স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘর উঁকিঝুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার খেলায় সে কথা শোনা যাইতে পারে—কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে, তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ—সেও মিথ্যা। এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ—এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।

বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখও মিটিয়াছে, এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ; সে কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে, তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ চিঠির যদি উত্তর দাও তবে বুঝিব, না পলাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারি দিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল, নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর-একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না—কালো-কালো অক্ষরগুলা তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল। এ কী! এ কী হইল! এ কেমন করিয়া হইল! এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো-একটা আশ্রয় পাইবার জন্য জলের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা-হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া উর্ধ্বশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা।"

সেই স্নেহের সম্বোধন উচ্ছ্বসিত হইবামাত্র তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্‌

বন্ধ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কাহার উপর রাগ, কাহার উপর রাগ, যখন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, 'এ চিঠি লইয়া আমি কী করিব।' স্বামী যদি জানিতে পারেন এ চিঠি আমার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বিশেষ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্থির করিল, চিঠিখানি সেই ছাড়া জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলনায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি হাতে সে শয়নগৃহে আসিল। ধোপাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, "ভাই বালি।"

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা খাটের উপরে ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ধোবা বড়ো কাপড় ময়লা করিতেছে। যে কাপড়গুলায় মার্কা দেওয়া হয় নাই সেগুলা আমি লইয়া যাই।"

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এইজন্য সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল; ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মনে মনে কহিল, 'ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ সব জানিতে পারিয়াছ! আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই!'

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টা করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া দ্রুত পদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর-একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেজের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঘরের এ দিক - ও দিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে, কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের খামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিদ্যুদ্‌বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের মত স্তব্ধ হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুত ধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল।

তখন ধোবা ডাকিতেছে, "মা-ঠাকরুন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।"

৩৪

রাজলক্ষ্মী আর সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল; দেখিল, রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, "পিসিমা তোমায় অসুখ করিয়াছে বুঝি ? করিবারই কথা। কাল রাতে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আসিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।"

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ, না, কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী কহিল, "হয়তো তোমার বউয়ের সঙ্গে আমার কিছু খিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে। তখনই নালিশ নিষ্পত্তির জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর সয় না। যাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার ছেলের অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ঐ লইয়াই আমার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ—আমার আজ আর কোনো কথা ভালো লাগিতেছে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমারও কিছু ভালো লাগিতেছে না, পিসিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়েই মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে, আর ঢাকা পড়ে না।"

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল, কহিল, "সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনও তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই ? একবার ঠাহর করিয়া দেখো দেখি।"

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস ? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না !"

বিনোদিনী অবিচলিত ভাবে কহিল, "পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ; তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী।"

রোষে রাজলক্ষ্মীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী একলা-ঘরে ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সকাল বেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহেন্দ্র বুঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিঘাত-স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভর্ৎসনা করিলেই বিদ্রোহী-ভাবে সে যথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এ সময়ে বাড়ি হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, "মাকে বলিস, আজ কালেজে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই

খাইতে হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দেখা হইবে।"

বলিয়া পলাতক বালকের মতো একরকম তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া, না খাইয়া, ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিসুদ্ধ জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

এক পশলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। অন্তর কোনো অসুখ হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই সে আজ খুব রাশকরা কাপড় জড়ো করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরও বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয়, তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে।

ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরের মেজের উপর বসিয়া। সম্মুখে কাপড় স্তূপাকার। খেমি দাসী এক-একখানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালী দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে।

মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসী কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাও, আমার এ ঘর হইতে চলিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন, কী করিয়াছি।"

বিনোদিনী। কী করিয়াছ। ভীরু কাপুরুষ। কী করিবার আছে

আছে তোমার। না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ।

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এ দিক, একবার ও দিক—তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মুহ্যমান হইয়া কহিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর, বিনোদ?"

বিনোদিনী। হাঁ, ঘৃণা করি।

মহেন্দ্র। এখনও প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ?

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, "ছাড়ো, আমার লাগিতেছে।"

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?

বিনোদিনী। না, যাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, "তোমার-ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।"

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, "চারি দিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছ; এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল, "এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।"

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "মহিন, কী করছিস!"

মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষ মাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তাহার পর পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, "আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অচপল ধৈর্য অবিচলিত ভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "যাইব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ রহিল না।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "বউঠাকরুন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসত না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।"

খেমি আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।"

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার খাওয়া দেখিল।

গোপাল চাকর আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, বুড়া-দেওয়ানজি আজ দাদাবাবুর (মহেন্দ্রের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে,

তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।"

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

৩৫

বিহারী এতদিন মেডিকাল কলেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিত, 'পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।'

আসল কথা, বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কলেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বৎসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের দুই জনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের দুজনকে শ্যামদেশীয় জোড়া-যমজ বলিয়া ডাকিত। গত বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে দুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আসিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাৎ জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্শ্বে এক কুটিরে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ-সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।

বিহারী। ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনো এ-সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুঁথি সাধে খুলিয়া রাখি বোঠান? হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক্‌, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ—একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে—সত্য করিয়া বলো, সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো। কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—

তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। আমার পোড়া কপাল! তুমিও কি না আশার ভালোবাসায় মজিলে! না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বোসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনও আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ! অন্ধ!

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমস্তই আমি শুনিব—কিন্তু, যে কথা বলিবার নহে সে কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা আমি জানি—কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, "আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।"

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, "এ কিছুতেই হইতে পারে না। কোনোমতেই না।"

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে।

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থির রাখিয়া কহিল, "সেইটেই হইল বড়। তোমার আপনার মত? আমার নিজের সুখ দুঃখ কিছুই নাই? তোমার আপনার ভালো হউক, সমাজের সকলের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই— ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।"

বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল; কহিল, "তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।"

বিনোদিনী। নাটক! নভেল!

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল। তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ-সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ-সমস্তই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না— কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে, বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া শান্ত নম্র স্বরে কহিল, "তুমি আমাকে কী করিতে বল।"

বিহারী কহিল, "অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।"

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ঐটুকু দুর্বলতা রাখো, ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বারবার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।"

বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুই জনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে।"

বিনোদিনী একটুখানি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটস্বরে কহিল, "সেই ট্রেনেই যাইব।"

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিপুষ্ট গৌরতনু লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর-মুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে যাস নি যে ?"

বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫১

যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, যাহা অসহ্য তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে রাত্রি, সে দিন, কাটিত না। বিনোদিনীকে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, "মাজি চিঠি।"

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্ করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে শত আশঙ্কা ও আশ্বাস একসঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল—কোনো কথা না বলিয়া আশা সে চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।"

আশা কহিল, "জানি না।"

রাত্রি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল—ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল; দেখিল—ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল, "বিনোদ।" কোনো উত্তর আসিল না।

'নির্বোধ। আমি নির্বোধ! তখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।'

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে ঘরেও আলো নাই; কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারে রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কিছুই বলি নাই।"

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষ্মী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের স্বরে কহিল, "তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম—সে যেখানেই থাক্‌, আমি তাহাকে বাহির করিবই।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "মহিন, যাস নে মহিন, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।"

মহেন্দ্র এক নিশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠাকুরানী

শাসন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই নিস্তব্ধ, এই বেদনা, সমস্ত দেহমনকে মাধুর্যশক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিবারের উদয় হইল—মধুর প্রভাত, দক্ষিণের [illegible], হৃদয়ের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল, বিনোদী প্রথম দুপায় সেই বিলাসিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত জড়াইয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু, এ কী আশ্চর্য! আঘাত যেন সমস্ত শূন্য হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। সেই [illegible] তাহার [illegible] [illegible] দুটি লইয়া [illegible] বিনোদীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। [illegible] তাহারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিনোদীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই শব্দহীন চক্ষুর আলোময়ী দীপ্তি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল, সেই [illegible] অন্তরালে সিক্ত স্থির হইয়া গভীর আবেগে দেখিতে দেখিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, [illegible] মতো সেই মূর্তি বিনোদীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই পা আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার পরে যে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো নিজের [illegible] বিনোদীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া [illegible] একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিনোদীর কণ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল। বিনোদী চক্ষু বুজিয়া সেই কল্পমূর্তিকে [illegible] করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে আঘাত করিতে যেন তাহার হাত উঠিল না—একটি অসম্পূর্ণ আগ্রহ চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

বিনোদী আজ নিজের অবস্থায় ঘরে থাকিতে পারিল না। আর কোনো দিকে মন দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] করিল।

কোণে টিপাইয়ের উপর [illegible] [illegible] [illegible]

ফোটোগ্রাফ ছিল। বিহারী ঢাকা খুলিয়া সেই ছবিটি ঘরের মাঝখানে আলোর নীচে লইয়া বসিল—কোলের উপর রাখিয়া দেখিতে লাগিল।

ছবিটি মহেন্দ্র ও আশার বিবাহের অনতিকাল পরের যুগলমূর্তি। ছবির পশ্চাতে মহেন্দ্র নিজের অক্ষরে 'মহিনদা' এবং আশা স্বহস্তে 'আশা' এই নামটুকু লিখিয়া দিয়াছিল। ছবির মধ্যে সেই নবপরিণয়ের মধুর দিনটি আর ঘুচিল না। মহেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখে নূতন বিবাহের নবীন সরস ভাবাবেশ; পাশে আশা দাঁড়াইয়া—ছবিওয়ালা তাহাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেয় নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে লজ্জাটুকু খসাইতে পারে নাই। আজ মহেন্দ্র তাহার পার্শ্বচরী আশাকে কাঁদাইয়া কত দূরে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু জড় ছবি মহেন্দ্রের মুখ হইতে নবীন প্রেমের একটি রেখাও বদল হইতে দেয় নাই, কিছু না বুঝিয়া মূঢ় ভাবে অদৃষ্টের পরিহাসকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

এই ছবিখানি কোলে লইয়া বিহারী বিনোদিনীকে ধিক্‌কারের দ্বারা সুদূরে নির্বাসিত করিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনীর সেই প্রেমে-কাতর যৌবনে-কোমল বাহুদুটি বিহারীর জানু চাপিয়া রহিল। বিহারী মনে মনে কহিল, 'এমন সুন্দর প্রেমের সংসার ছারখার করিয়া দিলি!' কিন্তু বিনোদিনীর সেই ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল মুখের চুম্বননিবেদন তাহাকে নীরবে কহিতে লাগিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের মধ্যে আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি!'

কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভগ্ন সংসারের নিদারুণ আর্তস্বরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী!

পিশাচী! বিহারী এটা কি পুরা ভর্ৎসনা করিয়া বলিল না ইহার সঙ্গে একটুখানি আদরের সুর আসিয়াও মিশিল! যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব ভিখারির মতো পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী

কি এমন অযাচিত অজস্র প্রেমের উপহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে! এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল ভোজনাবশেষ মুষ্টিভিক্ষা ভিক্ষা করিতেছিল। ক্ষেত্রের অন্নপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ এমন তাহারই মুখে যে ভোগ পাঠাইয়াছেন, হতভাগা বিহারী কিসের জন্য তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।

ছবি কোলে লইয়া এইরকম নানা কথা যখন সে একমনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিল মহেন্দ্র আসিয়াছে। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই কোল হইতে ছবিটি নীচে কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল—বিহারী তাহা লক্ষ করিল না।

মহেন্দ্র একেবারেই বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কোথায়।"

বিহারী মহেন্দ্রের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মহিনদা, একটু বোসো ভাই, শান্ত কথার আলোচনা করা যাইতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার বসিবার এবং আলোচনা করিবার সময় নাই। বলো, বিনোদিনী কোথায়।"

বিহারী কহিল, "তুমি যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া চলে না। একটু তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "উপদেশ দিবে? সে-সব উপদেশের কথা আমি শিশুকালেই পড়িয়াছি।"

বিহারী। না, উপদেশ দিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই।

মহেন্দ্র। ভর্ৎসনা করিবে? আমি জানি আমি পাষণ্ড, আমি নরাধম, এবং তুমি যাহা বলিতে চাও সমস্তই। কিন্তু কথা এই, তুমি জান কি না বিনোদিনী কোথায়।

বিহারী। জানি।

মহেন্দ্র। আমাকে বলিবে কি না।

বিহারী। না।

মহেন্দ্র। বলিতেই হইবে। তুমি তাহাকে চুরি করিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ। সে আমার, তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

বিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দৃঢ় স্বরে বলিল, "সে তোমার নহে। আমি তাহাকে চুরি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে।"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা!"

এই বলিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিতে দিতে উচ্চ স্বরে ডাকিল, "বিনোদ! বিনোদ!"

ঘরের ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই বিনোদ। আমি মহেন্দ্র, আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব—কেহ তোমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

বলিয়া মহেন্দ্র সবলে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার। অস্ফুট ছায়ার মতো দেখিতে পাইল, বিছানায় কে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিয়া বালিশ চাপিয়া ধরিল। বিহারী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসন্তকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, "ভয় নাই বসন্ত, ভয় নাই, কোনো ভয় নাই।"

মহেন্দ্র তখন দ্রুত পদে বাহির হইয়া বাড়ির সমস্ত ঘর দেখিয়া আসিল। যখন ফিরিয়া আসিল তখনও বসন্ত ভয়ের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বিহারী তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া তাহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহেন্দ্র আসিয়া কহিল, "বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছ।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, গোল করিয়ো না, তুমি অকারণে এই বালককে যেরূপ ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছ, ইহার অরূপ করিতে পারো। আমি বলিতেছি, বিনোদিনীর পত্রে তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "সাধু! মহাত্মা! ধর্মের আদর্শ খাড়া করিয়ো না। আমার স্ত্রীর এই ছবি কোলে করিয়া রাতে কোন্ দেবতার ধ্যানে কোন্ পুণ্যমন্ত্র জপ করিতেছিলে? ভণ্ড!"

বলিয়া, ছবিখানি মহেন্দ্র ভূমিতে ফেলিয়া জুতাসুদ্ধ পা দিয়া তাহার কাচ চূর্ণ চূর্ণ করিল এবং প্রতিকৃতিটি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বিহারীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

তাহার মত্ততা দেখিয়া বসন্ত আবার ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, দ্বারের দিকে হস্তনির্দেশ করিয়া কহিল, "যাও।"

মহেন্দ্র ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।



বিনোদিনী যখন খালিসুদ্ধ রেলের গাড়িতে চড়িয়া বারান্দা হইতে মাঠ ও ছায়ামহীরুহ এক-একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্নিগ্ধনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরুচ্ছায়াবেষ্টিত মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনালোক নিভৃত নীড়টি লইয়া বিধু-আচ্ছ-ন্নতায় স্বপ্ন দেখিতে থাকে ও অন্যমনস্ক হইতে সে যে স্বপ্নবিলাস করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। গাড়ির নিকট-স্থ শিশুশস্যক্ষেত্রের উপর সূর্যের আলো স্বর্ণসুধা দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুর প্রয়োজন নাই—এখন যেন এখানে অবসান! মহাতৃপ্তির শান্তির মধ্যে চক্ষু মুদিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, স্বপ্নবিহ্বল অন্ধকারের হইতে জীবনের দিন ভাসিয়া

নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্প বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। গাড়ি চলিতে চলিতে এক-এক জায়গায় আম্রকুঞ্জ হইতে মুকুলের গন্ধ আসিতেই পল্লীর স্নিগ্ধশান্তি তাহাকে নিবিড় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মনে মনে সে কহিল, 'বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেঁড়া করিতে পারি না; এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজে কর্মে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, জীবন কাটাইয়া দিব।'

তৃষিত বক্ষে এই শান্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শান্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য; চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহু দিনের রুদ্ধ স্যাঁৎসেঁতে ঘরের বাষ্পে তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পস্বল্প যে-সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে ইঁদুরের উৎপাতে ও ধুলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌঁছিল—ঘর নিরানন্দ, অন্ধকার। কোনোমতে সর্ষের তেলে প্রদীপ জ্বালাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোতে ঘরের দীনতা আরও পরিস্ফুট হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল—তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অন্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিবে না। কুলুঙ্গিতে পূর্বেকার দুই-একটা ধুলায় আচ্ছন্ন বই ও মাসিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরে বায়ুসম্পর্কশূন্য আমবাগানে ঝিল্লি ও মশার গুঞ্জনস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেয়েকে দেখিতে সুদূরে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চমকিত হইয়া উঠিল। ও মা! বিনোদিনীর দিব্য রঙ সাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড়

ফিরিয়াছে, যেন মেম-সাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারা করিয়া, বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। যেন কী একটা খবরের খোরাক পাইয়াছিল, তাহাতে নজির মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পাড়া হইতে সর্বসাধারণের সহস্র দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল। সমস্ত পাড়াই বিমুখ। কোথাও তাহার এক মুহূর্তের আশ্রয়ের স্থান নাই।

ডাকঘরের বুড়া পেয়াদা বিনোদিনীর আশাপাশবর্তী। প্রতিদিন বিনোদিনী যখন পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে তৈয়ার হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া পেয়াদাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "পাঁচুদাদা, আমার চিঠি আছে?"

বুড়া কহিল "না।"

বিনোদিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "থাকিতেও পারে। একবার দেখি।"

বলিয়া পাড়ার অন্য পাঁচজন-দশের চিঠি লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিষণ্নমুখে যখন ঘাটে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কোনো সখী সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, "কী লো বিনি, চিঠির জন্যে এত ব্যস্ত কেন।"

আর-একজন প্রগল্‌ভা কহিল, "ভালো ভালো! ডাকের চিঠি আসে এও তো ভাগ্যের কথা। আমাদের তো স্বামী দেবর ভাই বিদেশে কাজ করে, কিন্তু ডাকের পেয়াদার দয়া হয় না।"

এইরূপে কথায় কথায় পরিহাস স্ফুটতর ও কটাক্ষ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অনুনয় করিয়া লিখিয়াছিল, আমার প্রতি যদি নিতান্ত না হয়, তবে অন্তত অনুকম্পা করিয়া কিছু না হয় দুটো ছত্র চিঠি দেবে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া দিল, কিন্তু ডাকপেয়াদা শূন্য হাতে চলিয়া গেল যে দুই

সম্ভাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শত্রু-মিত্রের কৃপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শান্তি কোথায়!

গ্রামবাসী সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরও রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে গোপনে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। এখানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে শুশ্রূষা করিবার অবকাশ নাই—যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতস্থানে পতিত হয়। বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যতই আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। এখানে স্বাধীন ভাবে পরিপূর্ণ রূপে বেদনাভোগ করিবারও স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিল—

> ঠাকুরপো, ভয় করিয়ো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বসি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। দুঃখ এই, দণ্ডটি যে কত কঠিন তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে দয়া

নইলে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে আর বলিবার মত মন তোমার হইয়াছি আমার আর বাধা থাকিবে, আমি ইহাতে সুখ করিব। কিন্তু প্রভু, তোমাদের বাড়ির কি আমার আর না? লোকেরা আমার নামে—সন্তুষ্ট না হইলে আমার প্রাণ বাঁচে না, সেইজন্য যে বড় মনে হয়? তোমার দুই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার—তাহা যদি না পাই তবে আমার কোন নির্ভরস্থল নাই, প্রাণেশ। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিও না, প্রাণনাথ। আমার সামান্য সংসারের সীমা ছিল না, তাহাদের কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা হেঁট করাইবে ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতাম না। তোমার পত্র হইতে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্তু আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অসম্মানের মধ্যে আমাকে আর একটু রক্ষা করিয়া দিও। প্রভু। ইহাতে তোমার পাশে হইতে আমাকে কেহই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। এইটুকু মনের কথা জানাইলাম। আর যে সব কথা মনে আছে, জীবনের যত দুঃখ জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—সেই জন্য ক্ষমা করিলাম।

তোমার

বিনোদ-বোঠান

বিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল—আহার শেষে কি কি করিতে লাগিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে; সেখানেও কিছু আসিবে না—অভিমানে মুখ কি কঠিন হইয়াছে সম্মুখে রোদনের মধ্যে কি যেন একটা হইতে হয়!

মহেন্দ্রের চিঠি আসিল না। বিনোদিনী প্রত্যহ দিন গণনা করিয়া, আমার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। আমার মনের চাপা নিজের আবেগ এ

অপমানের মন্থনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহার-শক্তি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে দ্বার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, এক ছত্র চিঠি না, কিছুই না। সে শূন্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা কিছু চিহ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজলে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া, বিদ্রোহ-বহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া, বিহারীর কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতম প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল জ্বলিতেই লাগিল, দিগ্‌দিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও অশ্রুর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, 'আমার জীবন শূন্য, আমার হৃদয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য—এই শূন্যতার মাঝখানে একবার তুমি এসো, এক মুহূর্তের জন্য এসো, তোমাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।'

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন যথার্থ বল পাইল। মনে হইল, যেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণমাত্র করিয়া, দুরাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্ত সেচন করিয়া, হৃদয় কেবল অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেকে যেন সহায়বান মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর-সমস্ত ছাড়িয়া কেবল বাঞ্ছিতকে আকর্ষণ করিতে থাকাতে, প্রতি মুহূর্তে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যখন সমস্ত নিঃশব্দ অন্ধকার ঘর নিবিড় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—যখন সমাজ-সংসার, গ্রাম-পল্লী, সমস্ত বিশ্বভুবন একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত শুনিয়া চকিত হইয়া সসংকোচে দাঁড়াইয়া উঠিল, অতঃপর নিঃশব্দে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, "প্রভু, আসিয়াছ?"

তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর-কেহই তাহার দ্বারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, "আসিয়াছি, বিনোদ।"

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড বিতৃষ্ণার সহিত বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, যাও এখান হইতে। এখনই যাও।"

মহেন্দ্র অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"ভালো দিদি, তোর কিন্তু অর্থ যদি হয়"—এই কথা বলিতে বলিতে মোটা মোটা শরীরে দিদিমণি বিনোদিনীর ঘরের কাছে আসিয়া "ওমা" বলিয়া মস্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

৩৯

পাড়ায় আবার একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পাড়ার মুরুব্বিরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বলিল, "এ অসতীকে ঘরে রাখা চলিতে পারে না। কলিকাতায় কী করিয়াছিল তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এবার শহর হইতে মহেন্দ্র চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া তাহাকে আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা! এমন স্ত্রীলোককে ঘরে রাখিলে তো চলিবে না।"

বিনোদিনী আজ বিহারীর আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর আসিবে, কিন্তু উত্তর আসিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার উপরে বিহারীর বিরক্ত হইবার অধিকার আছে। আমি কেন তাহাকে এত বকাইতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে বুঝিতে দিলাম যে, যে আমার

প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জন্য যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক ? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামান্য দুই ছত্র চিঠিও না—আমি এত তুচ্ছ, এত ঘৃণার সামগ্রী ?' তখন ঈর্ষার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সে কহিল, 'আর-কাহারও জন্য এত দুঃখ সহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্য নয়। এই দৈন্য, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্য আমাকে বহন করিতে হইবে—এতবড়ো ফাঁকি আমি মাথায় করিয়া কেন লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম না। নির্বোধ ! আমি নির্বোধ ! আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম !'

বিনোদিনী যখন কাঠের মূর্তির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার পিসিশাশুড়ি জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহাকে কহিল, "পোড়ারমুখী, কী সব কথা শুনিতেছি !"

বিনোদিনী কহিল, "যাহা শুনিতেছ সবই সত্য কথা।"

পিসিশাশুড়ি। তবে এ কলঙ্ক পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল—এখানে কেন আসিলি।

রুদ্ধ ক্ষোভে বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিসিশাশুড়ি কহিল, "বাছা, এখানে তোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি। পোড়া অদৃষ্টে আমার সবাই মরিয়া-ঝরিয়া গেল, ইহাও সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল ব্যাপার আমি সহিতে পারিব না। ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে। তুমি এখনই যাও।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি এখনই যাইব।"

এমন সময় মহেন্দ্র, স্নান নাই, আহার নাই, উস্কোখুস্কো চুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ,

দূর হয়। অকস্মাৎ মহিমেরই কোথা হইতে আসিয়া যে বিনোদিনীকে লইয়া বাহির হইবার জন্য দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিবে, এইরূপ তাহার সংকল্প ছিল। কিন্তু পূর্বদিন বিনোদিনীর অদ্ভুতপূর্ব দুর্বার অভিসার পাইয়া তাহার মনে নানাপ্রকার দ্বিধার উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে যখন বেলা হইয়া গেল, কেরানিদের সময় আসন্ন হইয়া আসিল, তখন তোরঙ্গ গাড়িখানা হইতে বাহির হইয়া, মন হইতে সবলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া, গাড়ি চড়িয়া মহেন্দ্র পটলডাঙায় বিনোদিনীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া প্রথমেই দরজার কাছে একটি প্রস্তুত হইল যে একটা পরিপূর্ণ হাঁক শুনিল, সেই শব্দে মহেন্দ্র একটা উচ্চারিত আনন্দ বোধ করিল—তাহার সমস্ত অবসাদ এক নিমেষে দূর হইয়া গেল। তাহার কৌতূহলী চোখদুটি তাহার উপরে দৃষ্টিকে তুলিয়া বিনোদিনীর পুনর্মিলনের ব্যগ্রতা বোধ হইল। এবার সে কোনো দ্বিধা সংশয়বশত না করিয়া একেবারে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া বলিল, "বিনোদ, তোমাকে কিনিবার জন্য তোমাকে একলা ফেলিয়া গেছি, এমন অপরাধ আমি করি। তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, তোমা হইতে দূরে গিয়াই বুঝিতে হইবে। তাহার পর তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, করিয়াছ বলিলে, আমি তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। আমি তোমাকে আর করিয়া যাহা সহ্য করিতে পারিতেছি, তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া একেবারেই হইবে—তখন যদি আর থাকিত, না যদি আর তোমাকে সঙ্গে রহিত দূরে চলিয়া যাইবে। আমি সমস্তই এখন অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আর আমাকে পরিত্যাগ করিয়ো না। আমরা একেবারে দূরে চলিয়া যাইব, এখন তোমাকে বলিতে সময় নাই।"

বিনোদিনী আপনার মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমাকে সঙ্গে লইয়া চলো। তোমাকে আমি ছাড়ি নাই?"

মহেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা।"

বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষ্মী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামসম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ! ভদ্রসমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।"

মহেন্দ্র যে ভাবোন্মাদের রাজ্যে ছিল, সেখানে এই একটা আঘাত লাগিল। তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। এই সহজ কথাটা নূতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অজ্ঞাত সুদূর পল্লীর অপরিচিত গৃহদ্বারে মহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে, ইহা তাহার এক সময়ে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় গ্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে ঘর হইতে পথে বাহির করিতেছে, মহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অদ্ভুত অধ্যায় লিখিত হইল। তবু তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে এবং ভদ্রসমাজ আছে।

মহেন্দ্র যখন নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তখন বৃদ্ধা কহিল, "যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না—আর এক মুহূর্তও দেরি করিয়ো না।"

বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। অস্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী পুঁটুলিহস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেন্দ্র যখন গাড়িতে উঠিতে গেল বিনোদিনী কহিল, "না, স্টেশন দূরে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "এখনও তোমার লজ্জা বাকি আছে?"

বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল,

"স্টেশনে চলো।"

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু যাইবে না?"

মহেশ একটু ইতস্তত করিয়া আর যাইতে সাহস করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেশ খানের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া বাহিরের স্টেশনের অভিমুখে চলিল।

তখন গ্রামান্তরে আলোচনা চলিয়া গেছে। কেবল যে সকল [illegible] [illegible] [illegible] বিনয়ে [illegible] পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও [illegible] বাটি হাতে [illegible] [illegible] পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিয়াছে।

৪৮

মহেশ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সেই আশঙ্কায় হরলক্ষ্মীর আহার-নিদ্রা বন্ধ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—এমন সময় মহেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সন্ধ্যার [illegible] ফিরিয়া আসিল। [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া বসে মহেশ [illegible] বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল।

[illegible] [illegible] মহেশ প্রবেশ করিয়া দেখিল, [illegible] [illegible] মেয়েদিগের [illegible] [illegible] করিয়া রাখা হইয়াছে। হরলক্ষ্মী [illegible] [illegible] [illegible] মহেশকে এক [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছে। এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার পাইয়াছে।

মহেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠিয়া [illegible] [illegible] চলিয়া গেল। মহেশ [illegible] [illegible] কিছু পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেইখানেই থাকিব।"

রাজলক্ষ্মী বিছানার প্রান্তে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, একটু বোস্।"

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বসিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহিন, তোর যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কষ্ট দিস নে।"

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই"—বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল—"কিন্তু তুই তাহাকে এত দিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত দুঃখের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।"

রাজলক্ষ্মী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র সেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আজ রাত্রে তো এখানেই আছিস?"

মহেন্দ্র কহিল, "না।"

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন যাবি।"

মহেন্দ্র কহিল, "এখনই।"

রাজলক্ষ্মী কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এখনই? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না?"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "এ কটা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু বুঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্লজ্জ, তোর নিষ্ঠুরতায় আমার বুক ফাটিয়া গেল।"

বলিয়া রাজলক্ষ্মী ছিন্ন শাখার মতো বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

মহিম আর বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি দ্রুত
নিঃশব্দে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের বারান্দায় উঠিল। আলো
জ্বালিতে দেরী হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহিম উপরে উঠিয়াই দেখিল, বারান্দার সম্মুখে যে [illegible] [illegible]
আছে, সেইখানে আলো জ্বালিয়া [illegible]। সে মহিমের পায়ের শব্দ পায়
নাই, হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল টানিয়া
লইয়া উঠিয়া বসিল। এই সময়ে মহিম যদি একটিবার [illegible] [illegible]
তবে তখনই সে মহিমের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিয়া
লইয়া অনায়াসে [illegible] [illegible] মহিমের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া
তাহার জীবনের সমস্ত [illegible] [illegible] কহিত। কিন্তু, মহিম সে নিমেষ
[illegible] পারিল না। তবুও চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, [illegible] [illegible] [illegible]
পাইল, এ কথা বুঝিতে পারিল না যে, আজ আমাকে [illegible] [illegible]
[illegible] পরিণাম হবে। তাহাকে [illegible] [illegible] দিয়া কী হইবে, বরং
[illegible] পরিত্যাগ করিবার পথ মহিম নিজের হাতে একেবারে
বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আলো [illegible] [illegible] দিয়া বসিয়া রহিল। [illegible] [illegible]
চলিয়া যাইবে, কোনোরকমে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible]
হইল। মহিম কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে [illegible] [illegible]
করিতে লাগিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ঘটিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], এই [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
রহিল।

মহিম ভাবিতে লাগিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এই আকাশ-ভরা অন্ধকার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরন্তন স্থানটিতে অতি অনায়াসে গিয়া বসিতে পারি! কোনো প্রশ্ন নাই, জবাবদিহি নাই; সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, সেই সহজ আনন্দ! কিন্তু হায়, জগৎসংসারে সেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাদুরের একটুখানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল; ভালো-বাসিবার উন্মত্ত সুখ ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল না। এখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে; এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই—মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকন্না, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি, হঠাৎ মহেন্দ্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজসুলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেন্দ্রের পক্ষে দুরাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো যে বোঝা সে মাথায় তুলিয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেন্দ্র এক মুহূর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তখনও নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে—রাত্রির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের ন্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র পায়চারি বন্ধ করিয়া কী বলিবার জন্য হঠাৎ আশার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ

করিতে লাগিল, সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আসিয়াছিল ভাবিয়া পাইল না—তাহার কীই বা বলিবার আছে! কিন্তু কিছু একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না, বলিল, "চাবির গোছাটা কোথায়?"

চাবির গোছা ছিল বিছানার বালিশের নীচে। আশা উঠিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে—মহেন্দ্র তাহার অনুসরণ করিল। বালিশ নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা খাটের উপরে রাখিয়া দিল। মহেন্দ্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে এক-একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না, মৃদুস্বরে কহিল, "ও আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।"

কাহার কাছে চাবি ছিল সে কথা আর আশার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেন্দ্রের কাছে আর তাহার কান্না চাপা না থাকে। অন্ধকার ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু অধিক ক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেন্দ্রের খাবারের সময় হইয়াছে। তখনই আশা নীচে ছুটিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন কোথায়, বউমা?"

আশা কহিল, "উপরে।"

রাজলক্ষ্মী। তুমি নামিয়া আসিলে যে।

আশা নতমুখে কহিল, "উঁহার খাবার—"

রাজলক্ষ্মী। খাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি—বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নূতন ঢাকাই শাড়িখানা শিগ্‌গির পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ির আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই সাজসজ্জার প্রস্তাবে আশা মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেমন শর

হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উঁকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আস্তে আস্তে দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে।

চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জোর করিয়া খুলিয়া আবশ্যক কয়েকখানা কাপড় ও ডাক্তারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়া আছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "তোমার দুধ ও ফল আনিয়াছি মা, খাবে এসো।"

করুণমূর্তি বধূর এই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর শুষ্ক চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশ্রুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন এখন কী করিতেছে বউমা।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, মৃদুস্বরে কহিল, "তিনি চলিয়া গেছেন।"

রাজলক্ষ্মী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই।

আশা নতশিরে কহিল, "তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।"

শুনিবামাত্র রাজলক্ষ্মীর সমস্ত কোমলতা যেন দূর হইয়া গেল; বধূর প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না, আশা একটা নীরব লাঞ্ছনা অনুভব করিয়া নতমুখে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সময় হইতে বিনোদিনীর [illegible] আমার থাকিয়া সমস্ত [illegible] আহার [illegible] সাজিতে লাগিল, বিনোদিনী [illegible] বিনোদিনীর [illegible] [illegible] বিনোদিনী [illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible] কোনো [illegible] [illegible] ছিল না, [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] এতটুকু [illegible] ছিল—[illegible] তাহার [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] চাই, সেই [illegible] [illegible] করিতে না। [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] চাই, সেই [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible] তাহার [illegible] কোথায়। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে হইবে। [illegible] এই যে, [illegible] [illegible] [illegible] আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী বিহারীর এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিল। [illegible] [illegible] করিয়াই হইল, [illegible] [illegible] [illegible] পারিল না।

[illegible] বিহারীর [illegible] বিনোদিনী [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে, সেদিন হইতে আহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বিহারীর [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] করিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিতেছে না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াই [illegible]। বিনোদিনীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

না, নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, 'আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।'

বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে; তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না—তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নূতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট্‌ আপিসে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না; সে বলিল, 'আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা যাইবে।'

এই বলিয়া বিনোদিনী অন্ধকারে জানালা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ্ত কলিকাতার দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে, ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গেলেই এখনই তাহার দরজার কাছে পৌঁছানো যাইতে পারে; তাহার পরে সেই জলের-কল-ওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিভৃত ঘরটি—সেখানে নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে—হয়তো কাছে সেই ব্রাহ্মণবালক, সেই সুগোল সুন্দর সৌন্দর্য আয়তনেত্র সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছে—একে-একে সমস্ত চিত্রটা মনে

করিয়া যেমন যেমন বিনোদিনীর মনের পরিপূর্ণ স্ফুরিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এখনই যাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আগে হইতে হঠাৎ এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অসমর্থ হইত। কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুধু কল্পনা করিবার কথা নয়, উত্তর স্থির করিতে হইবে। বিনোদিনী ভাবিল, 'আজ যদি বিহারী উত্তর দেয়, তাহার পরে কোন্ পথে চলা আবশ্যক, স্থির করা যাইবে।' কিছু না বুঝিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আর সাহস হইল না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন রাত্রি সাড়ে-আটটা বাজিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত। বাহির হইতে আসিয়া অত্যন্ত উদ্বেলিত আশায় সে আসিয়াছে, কিন্তু একবার যখন বিনোদিনীকে বাসায় আনিয়া একেবারে সমাজ ও আশ্রয় হইতে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আজ তার সমস্যার পথ, নিজে সহসা তাহার কাছে স্পর্ধা করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত অদ্যকার রাত্রি জীবনের শ্রান্তি যেন তাহাকে আজ আসিয়া আক্রমণ করিল।

এত রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়া যা কিছু মহেন্দ্রের মনে অত্যন্ত সংশয় হইতে লাগিল। সে উদ্বেগের সঙ্গে বুঝিতেছে সে কথা আর নাই, সে স্বপ্ন ফেলিয়াছে। সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্নের ভিতর সম্পূর্ণ আজই অস্পষ্ট হইয়া গেল।

বিনোদের বুকের কাছটা ধুকধুক করিতে লাগিল, যেন কোথাও আশ্রয় তাহাকে করিতে হইবে। অশিক্ষিত বুদ্ধি আমার সমস্যার মধ্যে পড়িয়া আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার অন্তরে মনে হইল যে বিনোদিনী যে একলা উপায়হীন ও দুর্বল, তাহা হইলে এখন সে আসিয়াছে তাহার নিকট এক আশ্রয়ের আশায়

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই-সমস্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাসার সমস্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কখনও নিজের বা পরের আরামের জন্য চিন্তা করে নাই—আজ হইতে একটি নূতনগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপর্যাপ্ত ধূমোদ্গার করিয়া মিট্‌মিট্‌ করিতেছিল, তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প্‌ কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে স্যাঁৎস্যাঁৎ করিতেছে, মিস্ত্রি ডাকাইয়া বিলাতি মাটির দ্বারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রাস্তার দিকে দুটো ঘর যে জুতার দোকান-দারদের হাতে ছিল, তাহারা সে দুটো ঘর এখনও ছাড়ে নাই, তাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমস্ত কাজ তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝার আরও বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সিঁড়ির কাছে কিছু ক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল —বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এতদিন সমস্ত পৃথিবীকে ভুলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই ; আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিল এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল ; এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তরালে তাহার যেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে।"

বিনোদিনী কেবলই হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিছুমাত্র না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি আর দুই-এক দিনের মধ্যেই সমস্ত আসবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না—তুমি আর একটিও আসবাব আনিয়ো না, এখানে যাহা আছে তাহা আমার আবশ্যকের চেয়ে ঢের বেশি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি-হতভাগাও কি সেই ঢের-বেশির মধ্যে।"

বিনোদিনী। নিজেকে অত 'বেশি' মনে করিতে নাই, একটু বিনয় থাকা ভালো।

সেই নির্জন দীপালোকে স্তব্ধ নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্রের মনে আবার সেই মোহের সঞ্চার হইল।

অন্যদিন হইলে হয়তো সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত—কিন্তু এ যে বাড়ি নয়, সেইজন্য মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একাকী সে মহেন্দ্রের আশ্রয়ের মধ্যে, তাই নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরুষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, "এখানে তুমি তোমার বই-কাগজগুলো আনিয়া রেখো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবুও যে আমি আমার আবশ্যকের মধ্যেই গণ্য হই। অন্তত 'ঢের বেশির' দলে নই।"

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে থাকিবে কেন।

মহেন্দ্র। সে ঠিক কথা, এখানে তোমার আবশ্যক কিছুই থাকিবে না—বিনোদিনী, যতক্ষণ তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে না বলিবে, আমি অতিরিক্ত থাকিব না, কোনো প্রকারে তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বলিয়া এই উপলক্ষ্যে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আসিয়া কাপড়ে-বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গম্ভীর মুখে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।"

মহেন্দ্র তাহার সদ্যোজাগ্রত আগ্রহের মুখে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল, গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, "কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দূরে রাখিতে চাও। তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।"

বিনোদিনী। আমার জন্য তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এখন সে আর তোমার হাতে নাই—সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল তুমি একলা আছ বিনোদ। বিনোদ—বিনোদ—"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বল ভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই?"

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া লইল; কহিল, "মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনও তাহার কোনো অন্যথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে বলো।"

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্রী বিনোদ। তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্রয়োজন ছিল।

সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহ্য করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব—যে বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি সেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিরুত্তরে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর। আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।"

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহু যত্নে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ওই পাষাণ হৃদয়টাকে নিজের কঠিন মুষ্টির মধ্যে সবলে চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের দ্বারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল; কহিল, "আমি না থাকিলে এখানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।"

বিনোদিনী কহিল, "সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিসিমা খেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, সে আজ আমার এখানে আসিয়া বাস লইয়াছে। দ্বারে তালা দিয়া আমরা দুই স্ত্রীলোকে এখানে বেশ থাকিব।"

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ওই অটল মূর্তিকে বলপূর্বক চাপিয়া ধরিয়া পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্য মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে অবস্থায় বিশ্বজগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভয়ে, এমন সুদৃঢ় সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যাখ্যান, এত বড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই পীড়িত দলিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, 'আমি কি এতই অপদার্থ! আমার সম্বন্ধে এত বড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার আর কে আছে।'

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল—বিহারী। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষের সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। 'বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে—আমি তাহার উপলক্ষ্য-মাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত অবজ্ঞা।'

মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখনই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর দ্বারে গিয়া ঘা দিল তখন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাক্কার পর বেহারা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, "বাবুজি বাড়ি নাই।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, 'আমি যখন নির্বোধের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী সেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজন্যই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দয় ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গর্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।'

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।"

ভজু কহিল, "সে আজ চার-পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, 'এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাই, আর সমস্ত রাত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।'

বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কৌচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র যে রাত্রে বিহারীর ঘরে আসিয়া উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে কিছুই স্থির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববন্ধুর সহিত সংঘর্ষ কোন্-এক দিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অনুতাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র যখন উঠিল তখন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্মুখের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজ-চাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনও খোলা হয় নাই। প্রবাসী বিহারীর জন্য তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিত হস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো জবাব সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। লোকে স্নেহ-প্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র-দেবতার শুদ্ধ নির্মাল্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আজ মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিমুখ, তবু মহেন্দ্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী

এই অরসিক বিহারীকেই বরণ করিল! মহেন্দ্রও বিনোদিনীর দুই-চারিখানা চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত কৃত্রিম, তাহা নির্বোধকে ভুলাইবার শূন্য ছলনা।

নূতন ঠিকানা জানাইবার জন্য গ্রামের ডাকঘরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যগ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

পূর্বপ্রথা-মত মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইল। মহেন্দ্র স্নান ভুলিয়া গেল। উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন দ্রুত পদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পণ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর দুই-এক দিন চিঠির জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে। সে সম্ভাবনা তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল।

তখন চিঠিখানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের ম্লান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল; সে বুঝিতে পারিল, মহেন্দ্র কাল রাত্রে হয়তো পথে পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই?"

মহেন্দ্র কহিল, "না।"

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ এখনও তোমার খাওয়া হয় নি নাকি।"

বলিয়া সেবাপরায়ণা বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ আহারের আয়োজন

করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্‌ থাক্‌, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মুহূর্তের জন্য বিনোদিনীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তকাল নিরুত্তর থাকিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো?"

মহেন্দ্র কহিল, "ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।"

মহেন্দ্র এমন ভাবে বলিল, যেন বিহারী আজই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মুখ আর-একবার পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "এমন চঞ্চল লোকও তো দেখি নাই।— আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো খুব কি রাগ করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র। তা না হইলে এই অসহ্য গরমের সময় কি মানুষ শখ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

বিনোদিনী। আমার কথা কিছু বলিলেন না কি।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিখানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি—লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা সংবাদ কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা তুমি পড়িয়া[illegible]

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে হস্ করিয়া মিথ্যা কথা কহিল, "না।"

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া, জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মহেন্দ্র কহিল, "আমি বাড়ি যাইতেছি।"

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ আমি তাহাই করিব। সাত দিন আমি বাড়িতে থাকিব। কলেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া খেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কিনা কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না—খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শূন্যগৃহে অনেক ক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্য বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, করিতেছ কী।"

"তুই যা এখান থেকে" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দুই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাণাহত জন্তুর ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষত পরিশ্রান্ত করিয়া মূর্ছিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারী যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, "খেমি, তুই এখনই যা—বিহারী-ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।"

খেমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বিহারীবাবুর বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন।"

বিনোদিনীর মনে আর সন্দেহের কোনোই কারণ রহিল না।

৪২

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।"

আশা মুখ নিচু করিয়া বলিল, "জানি না মা।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?"

আশা কেবলমাত্র বলিল, "না।"

রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনও সম্ভব হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মহিন কখন গেল।"

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, "জানি না।"

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কিছুই জান না! কচি খুকী! তোমার সমস্ত চালাকি।"

আশারই আচরণ ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ মতও রাজলক্ষ্মী তাঁর ঘরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই

ভর্ৎসনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না, এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব তাহাও আমি বলিতে পারি না।' যে লোক ভালোবাসে তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয় তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয় আশা তাহার কী জানে! যে লোক অন্যকে ভালোবাসে তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে!

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃদু জুতার শব্দ পাইলেন—কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, "কে ও।"

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, "কে যায় গো।"

তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য-ঠাকরুন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য সে লজ্জা,

ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদু স্বরে বউকে বলিলেন "বউমা, পার্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে" তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।"

বাড়ীর দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাঁহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত মূঢ়দের সহিত নির্লজ্জ ভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরুন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভালো আছ তো বাবা ?" তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। কুশল-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধূর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের বুঝি কী দরকার আছে।"

আশা দুরুদুরুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ির কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনো মতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যমনে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র, সেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন! এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল—আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিজড়িত ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে? এত বির[illegible] যদি, তবে ও

শয্যায় আর বসিয়ো না মহেন্দ্র! এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই-সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্ম-বিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে, তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে 'এসো আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো—আমার অটলনিষ্ঠ সতী-প্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো'। সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্যধর্মচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না, সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল। সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক, এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে শোবারঘরেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদু স্বরে বউকে বলিলেন "বউমা, পার্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার উঠাইয়া আনে" তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।"

বাড়ীর দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এ দিকে আচার্য ও তাঁহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত মূঢ়দের সহিত নির্লজ্জ ভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরুন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভালো আছ তো বাবা?" তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে নিরালে বধূর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের বুঝি কী দরকার আছে।"

আশা দুরুদুরুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ির কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র, সেই ঘরই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই শুভ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল—আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিতে-পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও

শয্যায় আর বসিয়ো না মহেন্দ্র! এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই-সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্ম-বিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে।

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে, তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে 'এসো আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো—আমার অটলনিষ্ঠ সতী-প্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো'। সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না, সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল। সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক, এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

এক সময় কড়িকাঠ হইতে মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সম্মুখের দেয়ালের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত সেও যেন তাহার জোড়া ভুরুর ভিতর হইতে এই ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আসিল। আশা আপনার মূর্খতা ঘুচাইবার জন্য আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম ও শাশুড়ির সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের পাঠ্যবইগুলি ঘরের এক ধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলস ভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রূপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল—পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত আছে, সেইজন্য আহার লইয়া গিয়া ব্যাঘাত দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আসিতে দেখিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে খবর দিলেন। মহেন্দ্র খাইতে উঠিবা মাত্র আশা ঘরের কোণে ছুটিয়া গিয়া নিজের

ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার খাতাপত্রগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্য দুধ জাল দিতেছে। কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে দাসী রাজলক্ষ্মীর রাত্রের দুধ প্রতিদিন জ্বাল দিয়া থাকে সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের দ্বারা পূরণ করিয়া দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।"

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ির ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, 'যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্য বাড়ি আসিল, বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়িছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে তো আশারই দোষ। পুরুষ-মানুষ তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্ত্রীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে সিধা পথে রাখা।'

রাজলক্ষ্মী তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তোমার এ কী রকম ব্যবহার বউমা! তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।"

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিশ্বাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি

কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনিটাকে লইয়া কত দিনই বা মজিয়া ডুবিয়া থাকিবে।'

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা, বেশ তো মহিন।"

বলিয়া তখনই চাবি বাহির করিয়া রুদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন।—'বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল!' অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল।—'একটা সাফ ঝাড়ন বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্প্‌টা পাঠাইয়া দাও।' এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটির রাজাধিরাজের জন্য অন্নপূর্ণার ঘরে বিদ্যুত আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাকারিণীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া গম্ভীরমুখে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নীচে শুইবে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বহু যত্নে আশাকে আড়ষ্ট পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, "যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।"

এ প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রুষ্ট রাজলক্ষ্মী তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আশা বহু কষ্টে ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী দূর হইতে বধূর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে শব্দ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, "এখনও আমার দেরি আছে—আমার

কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে—আমি এইখানেই শুইব।"

কী লজ্জা! আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্য সাধিতে আসিয়াছিল।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী, হইল কী।"

আশা কহিল, "তিনি এখন পড়িতেছেন, নীচেই শুইবেন।"

বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার সুখ নাই—সমস্ত পৃথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মরুভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক রাত্রে আশার শয়নগৃহের রুদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল, "বউ, বউ, দরজা খোলো।"

আশা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কষ্টে নিশ্বাস লইতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, "বউ, তোমার রকম কী। উপরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছ যে! এখন কি এইরকম রাগারাগি করিবার সময়! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না। যাও, নীচে যাও।"

আশা মৃদু স্বরে কহিল, "তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।"

রাজলক্ষ্মী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল! রাগের মুখে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বসিতে হইবে! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীঘ্র যাও।

দুঃখের দিনে বধূর কাছে শাশুড়ির আর লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে-কিছু উপায় আছে তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজলক্ষ্মীর পুনরায় অত্যন্ত

শ্বাসকষ্ট হইল। কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া নীচে চলিল। রাজলক্ষ্মীকে আশা তাঁহার শয়নঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়া-বালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "থাক্, বউমা, থাক্। উহাকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আর দেরি করিয়ো না।"

আশা এবার আর দ্বিধামাত্র করিল না, শাশুড়ির ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর খোলা বই পড়িয়া আছে—সে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, সেই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্র সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্র আজ মনে মনে আশ্চর্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে তাহার সম্মুখে আসে না, দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে সে তখনই চলিয়া যায়। আজ এই রাত্রে এমন সহজে সে যে তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়ো বিস্ময়কর। মহেন্দ্র তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, আশার আজ চলিয়া যাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থির ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহেন্দ্র আর পড়িবার ভান করিতে পারিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা সুস্পষ্ট স্বরে কহিল, "মার হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভালো হয়।"

মহেন্দ্র। তিনি কোথায় আছেন?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেন্দ্র। তবে চলো, তাঁহাকে দেখিয়া আসি গে।

অনেক দিনের পরে আশার সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হাল্কা বোধ করিল। নীরবতা যেন দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল না, এমন সময় আশা স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোটো দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন; ভাবিলেন, বুঝি বা আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, "মহিন, এখনও ঘুমাস নাই?"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, তোমার সেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।"

এত দিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। বুঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরও আন্দোলিত হইয়া উঠিল—কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "যা, তুই শুতে যা। আমার ও কিছুই না।"

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ ব্যামো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা আছে। এই কারণে এবং মাতার মুখশ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সে উদ্‌বেগ অনুভব করিল।

মা কহিলেন, "পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আজ রাত্রের মতো একটা ঘুমের ওষুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী। ঢের ওষুধ খাইয়াছি, ওষুধে আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাইতে যাও।

মহেন্দ্র। তুমি একটু সুস্থ হইলেই আমি যাইব।

তখন অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী দ্বারের অন্তরালবর্তিনী বধূকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বউ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ।"

বলিতে বলিতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরও বাড়িয়া উঠিল।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব।"

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা ওষুধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে দুই দাগ থাকিবে—এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আসে, তবে এক ঘণ্টা পরে আর-এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে মূর্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন। এ আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই; এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত, সেইজন্য মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধূর প্রতি তাহার সম্ভ্রম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নবশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, "বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন।"

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাখা হাতে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "যাও বউমা, শুতে যাও।"

আশা মৃদু স্বরে কহিল, "আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।"

আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে।

এ খবরে রাজলক্ষ্মী খুশি হইলেন।

৪৪

রাজলক্ষ্মী যখন স্পষ্টই দেখিলেন আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, 'অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ্য করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় সেও ভালো।' তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অসুখ একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো-একটা খেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলক্ষ্মীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না—মহেন্দ্রের মন এতই উদ্‌ভ্রান্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এত বড়ো দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্‌কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষ্মীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কত দিন বিহারী আসে নাই তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?"

আশা বুঝিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দূর হইল। বিহারী-ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত—ইহার মতো তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর সঙ্গে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে? বড়ো

অন্যায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই।

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জমা হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মূঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্য বিহারী কত রূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশ আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া আজ আশা মনে মনে নিজেকে তীব্র ভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র সুহৃৎকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শত্রুকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই কৃতঘ্ন মূর্খকে কেন না শাস্তি দিবেন। ভগ্নহৃদয় বিহারী যে নিশ্বাস ফেলিয়া এ ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে নিশ্বাস কি এ ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেক ক্ষণ চিন্তিতমুখে স্থির থাকিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বউমা, বিহারী যদি থাকিত তবে এই দুর্দিনে সে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত—এতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পাইত না।"

আশা নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বুঝিল, রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। ঘরে কোনো সুখ নাই। যাহারা পরমাত্মীয় তাহাদের সঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দূর হইয়া গেলে তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না—তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্য ভারের মতো বক্ষে

চাপিয়া থাকে। মার সম্মুখে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না—তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্‌বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষ্যে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত সাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরও দুই দিন বাকি আছে—কেমন করিয়া সে দুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু বুঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, "যাইতে হইবে কেন, একটু বোসোই-না।"

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপোকে মার অসুখের খবর দেওয়া উচিত।"

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বুঝি বিশ্বাস হয় না।"

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্ৎসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।"

এই সামান্য কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল। এমন গূঢ় ভর্ৎসনা আশা আর কখনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র

নিজের অহংকারে আহত হইয়া নিশিত বিদ্রূপের সহিত কহিল, "তোমার কাছে ডাকাতি শিখিতে হইবে দেখিতেছি!"

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই সেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, "ডাকাতি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।"

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অনভ্যস্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কহিল, "তোমার বিহারী-ঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান—আবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছ বুঝি!"

আশা দ্রুত পদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার বন্যা যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য নহে। অপরাধে যে ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে! এত বড়ো নির্লজ্জতাকে পর্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অনুভব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেখানে সে ধুলায় লুটাইতেছে। এত দিন পরে তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ও দিকে বিহারীর কথা মনে আসিতেই বিনোদিনী সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতীক্ষা সহ্য হয় না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন সে আসে নাই।"

আশা শাশুড়িকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, "সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যাস।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা যাব।"

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

৪৫

পরদিন প্রত্যুষেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী!" ভজু কহিল, "বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।" মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়িতে আছেন না কি।" ভজু কহিল, "তিনি দুই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অনুপস্থিত ছিল, ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ

হইল, 'এইজন্যই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দূরে রাখিয়াছিল।'

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচ-ম্যানকে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার দ্বারের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সব খবর ভালো তো?"

সে কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, ভালো বৈকি।"

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রের-ব্যবহৃত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল—সেই কোমল আবরণকে দুই প্রসারিত হস্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে আঘ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

এইরূপে হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীর ভাবে বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে সেখানা তুলিয়া লইয়া, যেখানে চোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই সংবাদটাতে ঝুঁকিয়া পড়িল। একজন পত্রপ্রেরক লিখিতেছে, অল্প বেতনের গরিব কেরানিগণ রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিহারী বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন—সেখানে একবারে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে, পড়িয়া তাহার কিরূপ ভাব হইল? নিশ্চয় তাহার মনটা সেই দিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্য নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরও বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে 'হাম্বাগ' বলিল, বিহারীর এই কাজটাকে 'হুজুগ' বলিয়া অভিহিত করিল, কহিল, 'লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।' মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল; কহিল, 'ঔদার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মূঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।' কিন্তু হায়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি লোক হয়তো বুঝিবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী-এক অপরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয় দিন আগুন জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে, এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে —তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষুদ্র বাসার মধ্যে

যেন খরধার হইয়া উঠিতেছিল—তাহার সমস্ত উদ্যম তাহার নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তা-তীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে-ছিল। যে মূঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তির পথ চারি দিক হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা রহিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে—প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে—এই অন্ধকূপ, এই সমাজচ্যুত জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে খন্তায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তরতম হইতে এই-যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র আবদ্ধ বাসা, তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত—ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই-সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই রুগ্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, যাহা-দ্বারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই তপস্বিনীকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে। উপল যেমন স্রোতোবেগকে এক দিকে ঠেলিয়া তাহার

সুদুর্গম অভ্রভেদী পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্মৃত স্থান নাই যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল সুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্ষার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে এক মুহূর্তও বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচ্যগ্র-মাত্র অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহস হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংস্কৃত কাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীব্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।"

মহেন্দ্র কহিল, "নাহয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিয়ো না—'প্যালা মুঝ ভর্ দে রে'।"

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসে হঠাৎ আঘাত দিল; কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান ?"

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, "সে তো এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব দু দিনের—তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিখিতে পারিলে না?

মহেন্দ্র। সেজন্য তত দুঃখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিদ্যা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।

মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও, এ বয়সে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উত্থাপন করিয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে।

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান করিতে পারিতে না। আমার ভালোবাসা সম্বন্ধে যদি এত নিঃসংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ্য দুঃখ ঘটিত না। বিহারী পোষ না মানিবার বিদ্যা জানে, সে বিদ্যাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত তবে বন্ধুর কাজ করিত।

"বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না" এই বলিয়া বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন জানলার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া

রোষগর্জিত স্বরে কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের যে কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এত বড়ো কাপুরুষ নই।"

বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল—তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া যাইতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "চলো, এখনই চলো—পশ্চিমে যাই।"

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দু-দিন থাকিব না—ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, "সেই ভালো, আজ রাত্রেই চলো।"

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জন্য রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার মতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাৎ সে খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্‌বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইয়া রহিল।

৪৬

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্য আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত

রাজলক্ষ্মী উদ্‌বিগ্ন হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা খবর লইয়া জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাসায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া স্তব্ধ হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্য দিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্য রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন—আজ আর কিছুই বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে, হঠাৎ বায়ু যেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া থাকিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে; কিন্তু এই অনাদরপূর্ণ অনুমানই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোন্মত্ততায় কোনো আপদকে কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই সে মাতার কঠিন পীড়াকে এতই লঘু করিয়া দেখিয়াছে—পাছে জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইয়াই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আর কোনোরূপ উৎসাহ রহিল না—মহেন্দ্রের অনুমান যে অমূলক, মরিয়া ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা দুটার সময় আশা কহিল, "মা, তোমার ওষুধ খাইবার সময় হইয়াছে।" রাজলক্ষ্মী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওষুধ

আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন, "ওষুধ দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।"

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল—সেই অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না, কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরুণ স্নেহে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; কহিলেন, "বউমা, তোমার বয়স অল্প, এখনও তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর বৃথা চেষ্টা করিয়ো না বাছা—আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি—আর কী হইবে।"

শুনিয়া আশার রোদন আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরূপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দ গতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের মধ্যেও এই দুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনই মহেন্দ্র আসিবে। শব্দমাত্রেই উভয়ের দেহে যে-একটি চমক-সঞ্চার হইতেছিল, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছিলেন। ক্রমে দিবাবসানের আলোক অস্পষ্ট হইয়া আসিল ; কলিকাতার অন্তঃপুরের মধ্যে সেই গোধূলির যে আভা তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আবরণও নাই—তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশ্বাসের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। রুগ্নগৃহের সেই শুষ্ক শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে উঠিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বউমা, আলো ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া দাও।"

আশা প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার যখন ঘনতর

হইয়া এই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বাহিরের অনন্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল তখন আশা রাজলক্ষ্মীকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, উঁহাকে কি একবার খবর দিব।"

রাজলক্ষ্মী দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "না বউমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেন্দ্রকে খবর দিয়ো না।"

শুনিয়া আশা স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, "বাবুর কাছ হইতে চিঠি আসিয়াছে।"

শুনিয়া মুহূর্তের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয়তো হঠাৎ একটা-কিছু ব্যামো হইয়াছে, তাই সে কোনোমতেই আসিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইয়াছে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে।"

আশা বাহিরের প্রদীপের আলোকে কম্পিতহস্তে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভালো বোধ করিতেছিল না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অসুখের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। তাঁহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্য সে নবীন-ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কখন কী করিতে হইবে, তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে, এবং দুই টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিডির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য-অবশ্য জানাইবার জন্য চিঠির পুনশ্চের মধ্যে অনুরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল—প্রবল ধিক্কারে তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া তুলিল। এই নিষ্ঠুর কথা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে।

আশার বিলম্বে রাজলক্ষ্মী অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,

"বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে শীঘ্র আমাকে শুনাইয়া যাও।"

বলিতে বলিতে তিনি আগ্রহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তখন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরের কথা মহিন কী লিখিয়াছে, ওইখানটা আর-এক বার পড়ো তো।"

আশা পুনরায় পড়িল, "কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভালো বোধ করিতেছিলাম না, তাই আমি—"

রাজলক্ষ্মী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জ্বালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অসুখের কথা খবর দিতে গেলে। বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারও কোনো এলাকায় ছিল না—মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী সুখ হইল। আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত দুঃখেও তোমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি আসিল না!

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মস্‌মস্ শব্দ শুনা গেল। বেহারা কহিল, "ডাক্তারবাবু আয়া।"

ডাক্তার কাসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া খাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কী হইয়াছে বলুন তো।"

রাজলক্ষ্মী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, "হইবে আর কী। মানুষকে কি মরিতে দিবে না। তোমার ওষুধ খাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।"

ডাক্তার সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "অমর করিতে না পারি, কষ্ট যাহাতে কমে সে চেষ্টা—"

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন, "কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যখন

দিবারাত্র খুঁড়িয়া মরিত—এখন এ তো বেশ বাঁধিয়া যায়। যাও ডাক্তার-বাবু, তুমি যাও—আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই।"

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, "আপনার নাড়িটা একবার—"

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে—এ নাড়ি শীঘ্র ছাড়িবে এমন ভরসা নাই।"

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে নবীন-ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর ভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, "দেখুন, মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।"

মহেন্দ্র কষ্ট পাইবে, এ কথাটা রাজলক্ষ্মীর কাছে উপহাসের মত শুনাইল। তিনি কহিলেন, "মহিনের জন্য বেশি ভাবিয়ো না। কষ্ট সংসারে সকলকেই পাইতে হয়। এ কষ্টে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও।"

নবীন-ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্ত্যক্ত করিলে ভালো হইবে না। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বসিয়া আছ। ঝিকে ঘরে পাঠাইয়া দাও—পাশের ঘরে বসিয়া থাক্।"

আশা রাজলক্ষ্মীকে বুঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ—পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। ঝিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া নীরবে ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা; সেদিনকার মালাচন্দন, নববস্ত্র ও হোমধূমের গন্ধ; নববধূর শঙ্কিত লজ্জিত আনন্দিত হৃদয়ের নিগূঢ় কম্পন—সমস্তই স্মৃতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত বালক যেমন খাদ্যের জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত সুখের স্মৃতি আপনার খাদ্য চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদনে করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমার পবিত্র স্নিগ্ধ মূর্তি আশার অশ্রু-বাষ্পাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইল। পুনরায় সংসারের দুঃখ-ঝঞ্ঝাটে সেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না—আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রন্ধ্রমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর একখানা খাতায় চিঠির কাগজ রাখিয়া ঘনঘন চোখের জল মুছিতে মুছিতে চিঠি লিখিতে লাগিল—

শ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও—নহিলে

আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম।

তোমার স্নেহের

চুনি

৪৭

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের বিরোধবিচ্ছেদ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী যেন হারানো ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক গ্লানি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পর আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট হইল—মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাঁহার চিরন্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বে এই দুটি জা যখন বধূভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসারকে একত্রে বহন করিয়াছিলেন—তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্ব রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে সুদূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসঙ্গিনী পরম দুঃখের দিনে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন—তখনকার সমস্ত সুখ-দুঃখের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার, এই একটিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাকেও নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা কোথায়।

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হাতে লইয়া

কহিলেন, "দিদি।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মেজবউ।"

বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না, পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, মহিন কোথায়।"

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীর কী খবর।"

সাধুচরণ কহিলেন, "অনেক দিন তিনি আসেন নাই, তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এক বার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।"

সাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, "হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন আসিবে কিছুই বলা যায় না।"

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এক বার নবীন-ডাক্তারকে ডাকাই।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না মেজবউ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বলো।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।"

অন্নপূর্ণার মনের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দ্বারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অনাদরের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কখনোই তাঁহার ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কখনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা এক বার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র বিশৃঙ্খল, সাজসজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন বুঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন। আশা নত হইয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, "মাসিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মানুষ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা আমি কোনো কালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কত দিন চলিবে।"

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহসিক্ত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে

হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মূঢ়কে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস ও বল পাইয়া আশা অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, "মাসিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে এক বার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, চিঠি লেখা হইবে না।"

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।"

৪৮

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন তাহার মনে হইল, একটা-কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অন্নাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ—সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল—তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে সে সুন্দর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল।

তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, 'এ কাজে কোনো সুখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো গৌরব নাই—ইহা কেবল শুষ্ক তাড়না।' কাজের তাড়না বিহারীকে কখনও ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হইত তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কী ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, যাহা তাহাকে নিবৃত্ত না করিয়া অন্য কিছুতেই তাহার আসক্তি হয় না। পূর্বকার অভ্যাসমতে সে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চল ভাবে সুপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনও চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে দাবিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুধিত প্রাণীর পরিচয় বিহারীর পূর্বপরিচিত ছিল না, ইহাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার জীর্ণশীর্ণ ময়লা কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।

আষাঢ়ের মধ্য সপ্তাহ বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া সকালে নীল মেঘ ঘনচূড় গাছপালার উপরে আকাশের স্নিগ্ধভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে; সমস্ত নগরীর ইমারতের ছাদগুলির মধ্যে কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আয়নার মতো ঝকঝক করিতে থাকে। রবিবারে এই মধ্যাহ্নের মধ্যে যেমনি বিহারীর দুটি পদ্য স্মৃতি তার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীরনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার আর্দ্রকেশ অবগুণ্ঠনে উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, যাহার অঞ্চল হইতে সিক্ত-যূথীমালতীর গন্ধ নিবিড় ভঙ্গিতে ছড়াইয়া লইয়া সে এখনো আমারই হৃদয়ের উপরে অঞ্জনের তুলির নীল আভাসে অঙ্কিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার সুখে সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে— সেই দুর্লভ শুভ ক্ষণে কত সংগীত অনারব্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল বিনোদিনী সেদিনকার উদ্যত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্র-কুহর হইতে যে এমন রাগিণীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনও অনুমান করিতেও পারে নাই। যে বিনোদিনী দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া এক মুহূর্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশ্বাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন কোথায় স্থাপন করিতে পারে যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেন্দ্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই

কুৎসিত আকার ধারণ করিল যে, সে সম্বন্ধে বিহারী মনের মধ্যে স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়ের পূজার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায় যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো খবর লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় বেঞ্চের প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সম্মুখ দিয়া কুঠির পানসি যাতায়াত করিতেছিল, তাই সে অলস ভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া, আহারের আয়োজন করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল, বিহারী কহিল, "এখন থাক্।" মিস্ত্রির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্য তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল; বিহারী কহিল, "আর-একটু পরে।"

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে অন্নপূর্ণা। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমস্নেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অশ্রুজড়িত স্বরে কহিলেন, "বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিস কেন।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জন্য।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কাকীমা, তোমার এখনও খাওয়া হয় নাই?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, এখনও আমার সময় হয় নাই।"

বিহারী কহিল, "চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিই গে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ

খাইয়া বাঁচিব।"

মহেন্দ্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীর নিকটে সে দিক্‌কার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, "নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন একবার কলিকাতায় চল্।"

বিহারী কহিল, "কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদির বড়ো অসুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মহিনদা কোথায়।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।"

শুনিয়া মুহূর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি সকল কথা জানিস নে।"

বিহারী কহিল, "কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।"

তখন অন্নপূর্ণা, বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়নের বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জল-স্থল-আকাশের সমস্ত রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনাভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।—'মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আত্মসমর্পণ সমস্তই ছলনা! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জ ভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল। ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে যে আমি, মূঢ়, তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।'

হায় মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতস্মৃতি পূর্ণিমার রাত্রি,

তোমাদের ইম্প্রুভমেন্ট কোথায় গেল!

৪১

বিহারী ভাবিয়াছিল, হয়তো আশার মুখের দিকে সে চাহিবে কী করিয়া। সেইটুকুর মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন জনহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহূর্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরোয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন নিবিড় মহামেঘের মত লজ্জায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভৃত্যদিগকে সে স্নিগ্ধ ভাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে গভীর অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেছে, যে অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতুক কৃপা-দৃষ্টি-বর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুণ্ঠিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন্ প্রাণে।

কিন্তু এ-সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রহিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা দ্রুত পদে আসিয়া বিহারীকে বলিল, "ঠাকুরপো, একবার শীঘ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ো কষ্ট পাইতেছেন।"

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশ্য ভাবে এই প্রথম আলাপ। দুঃখের দুর্দিনে একটিমাত্র আঘাত ঝড়ের মত সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়; যাহারা দূরে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ বন্যার একটিমাত্র সংকীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র আশার সংসারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই দুর্ঘটনা

হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। দুর্দিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা-সৌন্দর্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে—ছোটোখাটো আবরণ-অন্তরাল বাছ-বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে—তাহাতে আর ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "কেমন আছিস বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার অসুখ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতাম।"

রাজলক্ষ্মী মৃদু স্বরে কহিলেন, "সে কি আর আমি জানি না বাছা। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুঙ্গিতে ওষুধপত্রের শিশি-কৌটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন রাজলক্ষ্মীর নাড়ি দেখিতে উদ্যত হইল রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার নাড়ির খবর থাক্‌—জিজ্ঞাসা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিস কেন বেহারি।"

বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার কৃশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠার হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, "তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র-শীঘ্র সারিয়া ওঠো মা, আমি

ততক্ষণ খাবার আয়োজন করিয়া রাখি।"

রাজলক্ষ্মী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সকাল সকাল আয়োজন কর বাছা—কিন্তু খাবার নয়।"

বলিয়া বিহারীর হাত টানিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেখিবার লোক কেহ নাই। ও মেজোবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও—দেখো না, বাছার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তুমি সারিয়া ওঠো দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি সম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার আর সময় হইবে না মেজোবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল—উহাকে সুখী করিয়ো, আমি উহার ঋণ শুধিয়া যাইতে পারিলাম না—কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।"

বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না—কাঁদিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা অশ্রুজলের ভিতর দিয়া বিহারীর মুখের দিকে স্নেহদৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজলক্ষ্মীর হঠাৎ কী মনে পড়িল, তিনি ডাকিলেন, "বউমা, ও বউমা।"

আশা ঘরে প্রবেশ করিলেই কহিলেন, "বেহারির খাবারের সব ব্যবস্থা করিয়াছ তো।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটিকে সকলেই চিনিয়াছে। গেটের ভিতর ঢুকিতেই দেখি, কিনুগোয়ালা দই ক্ষীর মাথায় লইয়া বাড়ি হন্ হন্ করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিতেছে—বুঝিলাম, এ বাড়িতে এখনো আমার খাতির লুপ্ত হয় নাই।"

বলিয়া বিহারী হাসিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত স্মিতহাস্যে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী এ সংসারের কতখানি আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না—অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিমুখ ভাব তাহার আচরণে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেই অনুতাপের ধিক্কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মেজবউ, বামুনঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে—আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।"

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার ভদ্রসন্তানকে বাঙাল বল? এ তো আমার সহ্য হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিষাদভার যেন লঘু হইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেক বার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষ্মীর মুখে মহেন্দ্রের নাম এক বারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে স্তম্ভিত হইল।

রাজলক্ষ্মীর একটু নিদ্রাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মার ব্যামো তো সহজ নহে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।"

বলিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি না বেহারী? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।"

বিহারী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।"

অন্নপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারি, আর-একটা কথা তোর কাছে বলি। আমার মুখের দিকে চা্। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস, তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুক ভাঙিয়া গিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, 'পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব—ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।' কহিল, "বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্য মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি কাকীমা? মাঝে মাঝে সে দুদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথায় আধখানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাসিমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষ্মীর পীড়া সম্বন্ধে বিহারীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই সেবাশুশ্রূষার খুঁটিনাটি শুনিতে আসিল। পতিব্রতা আশার মুখে নিবিড় দুঃখের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির সঞ্চার হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন যুগের দেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে—সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাকালীন সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাঙ্কে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

৫০

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, "ও কী কর, আমি তোমার জন্যে সেকেণ্ড্ ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।"

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না, নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস-উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে যে অনায়াসেই এই ধন-সম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যখন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর সজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চ্যুত করিয়াছে, সেই মহেন্দ্রের হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল তখন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিন্য বড়ো-একটা ছিল না, কিন্তু এখন

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, "তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।"

অন্নপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারি, আর-একটা কথা তোর কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাস্। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস, তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুকে মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, 'পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব—ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।' কহিল, "বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্য মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি কাকীমা? মার ব্যামোতে সে দু-দিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথায় আধখানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাসিমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষ্মীর পীড়া সম্বন্ধে বিহারীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎসুক্যের সহিত শুনিতে আসিল। পতিব্রতা আশার মুখে নিস্তব্ধ দুঃখের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির সঞ্চার হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন যুগের দেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে—সে এখন আর সামান্যা নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলক্ষ্মীর পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন আশাকে বিদায় করিল তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।"

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাঙ্কে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

৫০

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, "ও কী কর, আমি তোমার জন্যে সেকেণ্ড্‌ ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।"

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না; নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস-উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে যে অনায়াসেই এই ধন-সম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যখন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চ্যুত করিয়াছে, সেই মহেন্দ্রের হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল তখন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিন্য বড়ো-একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন

পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে এক বেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল-উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তব্ধ, এমন আবৃত, এমন সুদূর, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, কেবলই ভাবিতে লাগিল, 'বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে আঘ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।'

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকিট করিব বলো।"

বিনোদিনী কহিল, "পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো, কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে নামিয়া পড়িব।"

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোরূপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো মুশকিল। সে খুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এ দিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে।

বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল—কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীঘ্রই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযাত্রিণীদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা সেখানকার সমস্ত খবর লইত, যাত্রিশালায় আশ্রয় লইত এবং যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকগুলোই দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্যকতায় প্রতিদিন আপনাকে

হতমান বোধ করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃস্নেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে তাহা কেহ কল্পনাও করিত না।

একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে দুই জনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকস্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ি যত আসিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারও দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, রুদ্ধ গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উদ্যমে নিজেকে প্রত্যহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিত্যসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উন্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে স্টেশনে একটি কাঁচের বাক্সের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোস্ট্‌ আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে-সকল লোকের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজ্জিত একখানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীলাল নামটি অসাধারণ নহে; পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না—তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে মহেন্দ্র একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল; বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, "কিছুদিন

এলাহাবাদেই থাকিব।"

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামত মহেন্দ্রকে চালাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অতৃপ্ত হৃদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান প্রতিদিন আহত হইয়া তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া ফিরাইতে পাইলে সে বাঁচিয়া যায়—কিন্তু ইচ্ছার অনুকূল হইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রে সম্মতি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, "যখন বাহির হইয়াছি তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি যাইব না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "সেই ভালো।" বলিয়া দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অন্ধকারমুখে বেঞ্চে বসিয়া রহিল। যতক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল ততক্ষণ সে স্থির হইয়া থাকিল। যখন বিনোদিনী একবারও পশ্চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী একখানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। নিজের অহংকার খর্ব করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সম্মুখে বসিতে তাহার আর মুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চষা মাঠে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেন্দ্রের লজ্জা করিতে লাগিল; কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার স্ত্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তা'ও সে এই অনাবশ্যক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেন্দ্র রুদ্ধ অভিমান মনে

মনে পরিপাক করিয়া স্তব্ধভাবে কোচবাক্সে বসিয়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যমুনার ধারে একটি সযত্নরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, "বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দূরে থাকেন না—তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিলেই এ বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।"

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে এক বার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল; দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় সে প্রফুল্ল হইল; বিনোদিনীকে কহিল, "তবে চলো, সেই ধনীর ওখানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আসিব।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি আর ঘুরিতে পারিব না—তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।"

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া করুণ স্বরে কহিল, "আহা, তোমার তো বড়ো কষ্ট। এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই!"

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।"

বিনোদিনী কহিল, "তিনি আমাদের আত্মীয় হন।"

বিনোদিনী বৃদ্ধের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বসিবার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়া লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল তাহাতে মনে হইল, যেন সেখানে অদৃশ্য বিহারীর সঞ্চার সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা ঘ্রাণের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, স্তব্ধ বাতাসে সর্বাঙ্গে স্পর্শ করিল। কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে—স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃদ্ধ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে এরূপ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাসের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল।

৫১

হিমালয়শিখর যে যমুনাকে তুষারদ্রুত অক্ষয় জলধারা দিতেছে; কত কালের কবিরা মিলিয়া সেই যমুনার মধ্যে যে কবিস্রোত ঢালিয়াছেন তাহাও অক্ষয়। ইহার কলধ্বনির মধ্যে কত বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কত কালের পুলকোচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই যমুনাতীরে মহেন্দ্র আসিয়া যখন বসিল তখন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশ্বাসে, তাহার শিরায়, তাহার অস্থিগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে সূর্যাস্তকিরণের স্বর্ণবীণা যেন নীরব মূর্ছনায় অনাহত সংগীতে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান

হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর-ধূলি-জালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল।

বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণমাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অজ্ঞাত অনুচ্চারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা, নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনির্দিষ্ট অপরিস্ফুট আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ওই তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। 'ওগো, পার করো গো, পার করো'— মহেন্দ্রের বুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌঁছিতেছে, 'ওগো, পার করো।'

নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহু দূরে; তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা; কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। 'ওগো, পার করো গো।' খেয়ানৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কত কাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে—'ওগো, পার করো।'

মেঘের এক প্রান্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা

দিল। জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমান্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্তের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধারাবাহিকতা ছিঁড়িয়া গেল—অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিষ্যৎকালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত; শুধু এই রজতধারাপ্লাবিত বর্তমানটুকু, যমুনা ও যমুনাতটের মধ্যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষ্মীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানলা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁধিয়াছে—ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেন্দ্রের মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, আমি যমুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তুমি যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে সেই সংবাদ দিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিল দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, "যাও যাও, তুমি এ বিছানায় বসিয়ো না।"

জোয়ারের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল—মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেন্দ্র নিষেধ না মানে, এইজন্য বিনোদিনী শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ। কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ।"

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে কে। সে বিহারী?"

বিনোদিনী কহিল, "তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ?

বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক জানিবই।

মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে এক বার অনুভব করিয়া লইল।

মহেন্দ্র সেই পুষ্পাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দ্বারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল; মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, "ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।"

বিনোদিনী অবিচলিত মুখে কহিল, "তোমার ভালোবাসার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।"

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনও বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না—এইটুকু বিশ্বাসের ফাঁসি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশান্তরে টানিয়া মারিতেছ কেন। তুমি মরিলে, কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না, আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারি দিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না শূন্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত সুধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ও পারের অস্পষ্টতা, সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেন্সিলে-

আঁকা একটি চিত্রমাত্র—সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক।

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিকড়-সুদ্ধ তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় আরও যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই-সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্‌বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহার সম্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর-একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই-যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে। এখন ইহাকে শান্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল তাহার উপরে মহেন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা—এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যমুনাতট, এই অপূর্বসুন্দর পৃথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেখানে সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে—জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুদ্রতম কাজটুকু পর্যন্ত ভুলিবে না—এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে তাহার বোধোদয়ের নূতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন্ পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সূচ্যগ্রপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

মহেন্দ্র তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বদ্ধ। দ্বারে আঘাত দিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ কি।"

বিনোদিনী কহিল, "না। তুমি এখন যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে; আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "কথা আর আমি শুনিতে পারি না—তুমি যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।"

অন্য কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রের আবেগ আরও বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। সে ভাবিল, 'এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন-তখন এমনতরো অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্যায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছি।' এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, 'আমি জয়ী হইব; ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।'

আহারান্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্য ও মার জন্য কিছু ভালো নূতন জিনিস কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দ্বারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না; তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জ্বলন্ত রোষে সবলে দ্বার খুলিয়া কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।"

কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী এক বার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুষ্ক ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল—পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে এইজন্য তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী এক সময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে; মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ ঘৃণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মুহূর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া "মহেন্দ্র" "মহেন্দ্র" করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্র মৃদু স্বরে কহিল, "মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।"

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।"

বিহারী কোনো মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই স্থান দৃশ্য হইতে এখনই নিজেকে দূরে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অনুনয়স্বর শুনিবামাত্র কণকালের জন্য তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, "আর যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।"

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনও তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি—তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—"

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, "সে কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। সে কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।"

বিনোদিনী। সে কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্য এক বার আমি তোমাকে বলিতে বসিয়াছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আসিবে-যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দূরেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুই মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার মন একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব।

সেইজন্ত আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বোসো।

"আচ্ছা চলো" বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্তত্র কোথাও যাইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ তাহা নহে। এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন করিয়াছিলে—এ ঘর তোমার জন্তই উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি, ওই ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।"

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল, বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি বোসো। আমার মাথা খাও, উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।"

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার খাওয়া হইয়াছে ঠাকুরপো?"

বিহারী কহিল, "স্টেশন হইতে খাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া, কোনো জবাব না দিয়া, মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।

বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর-এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে?

বিহারী। না, এমন কখনোই হয় নাই।

বিনোদিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সমস্ত বুঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না ; আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।"

বিহারীর হৃদয় তখন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনত বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, "বোঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘৃণা করিতে পারি না। তুমি আর-একটি কথাও বলিয়ো না।"

শুনিয়া বিনোদিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, "সব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে হইবে—তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্নেহের পরিবর্তে তোমার শাসনই আমি গ্রহণ করিতাম—কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। আমি যে পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি তাহা আমাকে নির্বাসনেও টিকিতে দিল না। মহেন্দ্র গ্রামে আসিয়া, আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া, আমাকে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করিল। সে গ্রামে

আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয় বার তোমার আদেশের জন্য তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম—কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার—তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো, আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।"

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিক্ষণে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে-একটা ঔদাসীন্য জন্মিতেছিল ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র দ্বারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুখ হইয়া ছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয় তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর-কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, "এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ। দৃশ্যটি সুন্দর—

হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অঙ্ক, ইহার পরে আর-কিছুই ভালো লাগিবে না।"

বিনোদিনীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে যখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই—ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল; অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না—তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে! আজ তোমার নূতন নামকরণ করা যাক—বিনোদবিহারী।"

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযত ভাবে কথা কও।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, "তোমাকে আর-একটি খবর দিবার আছে—তোমার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাঁহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব—বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল; কহিল, "পিসিমার অসুখ?"

বিহারী কহিল, "সারিবার অসুখ নহে। কখন কী হয় বলা যায় না।"

মহেন্দ্র তখন আর-কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল, "যে কথা তুমি বলিলে তাহা

তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাট্টা?"

বিহারী কহিল, "না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।"

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনও তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনও হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর—তোমার একটা-কোনো ব্রতের একটা-কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব।

বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল।

পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, "পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর-কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

বিহারী গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, "ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"

৫৩

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "এখন ও ঘরে যাইয়ো না।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

আশা কহিল, "ডাক্তার বলিয়াছেন, হঠাৎ মার মনে, সুখের হউক, দুঃখের হউক, একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি একবার আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসি গে—তিনি টের পাইবেন না।"

আশা কহিল, "তিনি অল্প শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।"

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী-ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান—

তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন তাহাই করিব।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

বিহারী। বোঠান, ডাকিয়াছ? মা ভালো আছেন তো?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল। কহিল, "তুমি যাওয়ার পর হইতে মা যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিহারী কোথায় গেল।' আমি বলিলাম, 'তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে।' তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মুখে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্য বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভালোবাস সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘর হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিক ক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'বউমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব।' "

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা আছেন কেমন।"

আশা কহিল, "তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো—আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরও বাড়িয়াছে।"

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে—সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ,

না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের দল আজ কতখানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মার ঘরেও ঢুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য—বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুণ্ঠিত ভাবে কথাবার্তা কহিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের সুহৃৎ। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্য যে জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার করুণ চক্ষু তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহিলেন, "বিহারী, ফিরিয়াছিস?"

বিহারী কহিল, "হাঁ মা, ফিরিয়া আসিলাম।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোর কাজ শেষ হইয়া গেছে?"

বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লমুখে "হাঁ মা, কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর-কোনো ভাবনা নাই" বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বউমা তোমার জন্য নিজের হাতে রাঁধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে—কিন্তু আর বারণ কিসের জন্য বাছা। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না।

বিহারী কহিল, "ডাক্তারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না মা—তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি—মহিনের যে পশ্চিমের ডালরুটি খাইয়া অরুচি ধরিয়া গেছে—আজ সে তোমার মাছের ঝোল খাইয়া বাঁচিয়া যাইবে। আজ আমরা দুই ভাই ছেলে-

বেলাকার মতো রেষারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অন্নে কুলাইতে পারিলে হয়।"

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।

সে ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, "পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু ম্লান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।"

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, "মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে তো আসিতে পারিতেছে না।"

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, "মহিনদা, এসো।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অর্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল।

মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।"

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্ফুরণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, ওঠ্।"

মহিনের নাম উচ্চারণ মাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া, মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া,

খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী কষ্টে পাশ ফিরিয়া দুই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও কথা বলিস নে মহিন, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।"

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল—অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহেন্দ্র খাটে বসিলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পার্শ্বে স্থান-নির্দেশ করিয়া আশাকে কহিলেন, "বউমা, এইখানে তুমি বোসো—আর আমি একবার তোমাদের দু-জনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। বউমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না, আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া এক বার এইখানে বোসো—আমার চোখ জুড়াও মা।"

তখন ঘোমটা-মাথায় আশা লজ্জার ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী যত্নে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন; কহিলেন, "আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম মহিন—আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে। মেজবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো—তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।"

অন্নপূর্ণা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোখের জলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মস্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

রাজলক্ষ্মী। বিহারি, এসো বাবা, মহিনকে তুমি এক বার ক্ষমা করো।

বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ় বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি—শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্—ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর-কিছু হইতে পারে না।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আর ওষুধ না বাবা! এখন আমি ভগবানকে স্মরণ করি—তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওষুধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম কর্ গে। বউমা, এইবার রান্না চড়াইয়া দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সম্মুখে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অশ্রু উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন্ন উঠিতেছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিস না কেন। ভালো করিয়া খা, আমি দেখি।"

বিহারী কহিল, "জানই তো মা, মহিনদা চিরকাল ওই রকম, কিছুই খাইতে পারে না। বোঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকার হইয়াছে।"

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি জানি, বিহারী ওই ঘণ্টটা ভালোবাসে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর-একটু বেশি করিয়া দাও।"

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আগে তুমি পাপিষ্ঠাকে মাপ করো পিসিমা, তবে আমি যাইব।"

রাজলক্ষ্মী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারও উপর আর রাগ নাই।

বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, "বউ, তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।"

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না পিসিমা, আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ সংসারের মন্দ হইবে না।

অন্নপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বাহিরে গেল। ফিরিয়া আসিলে পর রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বউ, এখন তুমি তবে চলিলে?"

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর সাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলক্ষ্মী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোঠান থাকুন না, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"

রাত্রে বিহারী বিনোদিনী এবং অন্নপূর্ণা তিন জনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর শুশ্রূষা করিলেন।

এ দিকে আশা সমস্ত রাত্রি রাজলক্ষ্মীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অনুতাপে প্রত্যূষে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় ঘুম অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তখনও অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষ্মীর ঘরের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, 'এ কি স্বপ্ন।'

বিনোদিনী একটি স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্য চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আজ আমি

আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম—আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না—কিন্তু তুমি যদি বল 'যাও' তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না—তাহার মন কী বলিতেছে তাও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না—সে চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে সেই ক'টা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।"

কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ ভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ আর শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনও হয়তো মনে মনে ভালোবাসে—এ কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে—কী জানি কী চক্ষে দেখিবে! কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল—আজ প্রত্যূষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ, কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, "মাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ—যাও, শুতে যাও!" অন্নপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে

নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, "চুনি, যদি সুখী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অন্যকে দোষী করিলে সেটুকু দুঃখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।"

আশা কহিল, "মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।"

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস—উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে—আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি। এ কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না ভুলিস তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি। তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্, যেন সে কখনও তোর কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নম্রমুখে কহিল, "কী করিতে হইবে, বলো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্য চা তৈরি করিতেছে। তুই দুধ-চিনি-পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা—উভয়ে মিলিয়া কাজ কর্।"

আশা আদেশপালনের জন্য উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এটা সহজ—কিন্তু আমার আর-একটি কথা আছে, সেটা আরও শক্ত—সেটাও তোকে পালন করিতেই হইবে। মাঝে-মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কী হইবে তাহা আমি জানি—সে সময় তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্র করিস নে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক

করিস না, তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই—জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনিই হইয়াছে—ভাঙনের দাগটুকু মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর-কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অনুরোধ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাশী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি এক দিনের জন্যও ভুলিস নে।"

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, "জল কি গরম হইয়াছে? আমি চায়ের দুধ আনিয়াছি।"

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "বিহারীঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।"

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বেচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়—ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে-বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে, তাই আমি জানলা-দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনীর সম্মুখেই আশাকে এইরূপ সহজ ভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দিত-চিত্তে কহিল, "মা কেমন আছেন তাই দেখিতে আসিয়াছি—মা কি এখনও ঘুমাইতেছেন।"

আশা কহিল, "হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারীঠাকুরপো বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা কোথায়।"

আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল।

আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তবু তিনি কহিলেন, "আয় মহিন, আয়।"

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ছি ছি, ও কথা বলিস নে মহিন—ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।"

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ ধুলা কিছুতেই ঘুচিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। দুই-একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা, এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম সে দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, "কাকীমা, আহ্নিকে বসিয়াছ নাকি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, তুই আয়।"

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, "মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয় দেখিলে!"

মহেন্দ্র কহিল, "হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়। বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে—আমি যাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "তোমাকেও নাহয় ক্যাবিনেটের মিনিস্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনও কিছু গোপন করি নাই—যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।"

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে। তুমি যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সম্মুখে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখে বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, "বিনোদিনীকে বিবাহ করিব এমন একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কী কথা বিহারী।"

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দূর করিল। কহিল, "বিহারি, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোনো যোগ আছে।"

বিহারী কহিল, "কিছুমাত্র না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ইহাতে রাজি হইবে।"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কেন রাজি হইবে না কাকীমা। আমি জানি, সে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে—এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি—সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

শুনিয়া মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

৫৪

ভালোয়-মন্দয় দুই-তিন দিন রাজলক্ষ্মীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ বেশ প্রসন্ন ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই—কিন্তু আমি বড়ো সুখে মরিলাম মহিন, আমার কোনো দুঃখ নাই। তুই যখন ছোটো ছিলি তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে—তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন—তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো সুখ।"

বলিয়া রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কাঁদিস নে মহিন। লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমস্তই আমি গুছাইয়া রাখিয়াছি, তোদের ঘরকন্নার জিনিসের কোনো অভাব হইবে না। আর-একটি কথা

আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাস নে—আমার বাক্সে দু-হাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে—কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস্ নে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল।"

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বাবা বিহারি, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস—ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শ্বশুরের পুণ্য হইবে।"

৫৫

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল, "ভাই বিহারি, আমি ডাক্তারি জানি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে সেও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো—এ কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে। বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই—কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শান্ত বিষাদের সহিত সেবাশ্রমের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এসো, এসো বাছা, বোসো।"

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, "এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বলো।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, তুমিই বলো, তুমি কী করিতে চাও।"

বিনোদিনী কহিল, "শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ—আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভৃতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন মন যাহা চায় তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত—এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।"

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোনো সুযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "বোঠান, তোমার একটা-কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার এমন কী আছে যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে পার?"

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, "ইংরাজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের এক গুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়—যদি তুমি—"

বিনোদিনী। ছি ছি, কী ঘৃণা! আমার চুল লইয়া কী করিবে! সেই অশুচি মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাছে থাকিতে পারিব না—আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে —বলো, তুমি লইবে?

বিহারী কহিল, "লইব।"

তখন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার দুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী সুগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিক বাদে বিহারী কহিল, "আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না?"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ—তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।" বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আহত হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, "তুমি জান না— এ তোমারই আঘাত—এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না।"

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যখনই বিনোদিনীকে দেখিয়াছে তখনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে—মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য কোনো সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময় শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল, মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয় বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যখন অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল, তখন সেই সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসে, মহেন্দ্রকে ভালো না বাসিবেই বা কেন? মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিরূপ অনিবার্য, আশা তাহার নিজের হৃদয় দিয়াই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে দুর্বিষহ দুঃখ তাহা আশা কল্পনাতেও সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারে না—মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। এক কালে সে বিনোদিনীকে ভালোবাসিয়াছিল, সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া সসংকোচ করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃদু স্বরে কহিল, "দিদি, তুমি চলিলে?"

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, "হাঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। এক সময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে—এখন সুখের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্যে রাখিয়ো ভাই, আর-সব ভুলিয়া যেয়ো!"

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "বোঠান, মাপ করিয়ো।"

তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।"

—